দুই ঠিকানা

সাধন চট্টোপাধ্যায়

নব সাহিত্য প্রকাশনী
১২৮/১ এ, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক
শ্রীমতী চন্দনা ঘোষ
১২৮/১এ, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক
অধীর রঞ্জন ঘোষ
১০৯বি, কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
রবীন দত্ত

প্রখ্যাত লোকায়ণিক

অরুণ কুমার রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

১

তাগিদ নিয়ে প্রিয়নাথ বাসায় ফিরছে। যে লক্ষ লক্ষ মানবসন্তান প্রতিদিন শহরের বিচিত্র কর্মযজ্ঞে দানা-পানির সন্ধানে বেরোয় এবং ফিরে আসে—প্রিয়নাথ তাদেরই দলের। দল বলাটা ঠিক হবে না হয়তো, যে সুর ছন্দ ঐকতানে দলের ভাবমূর্তি তৈরী হয়, এ বিশাল শহরে তা নেই। হয়তো সম্ভবও নয়, ভিন্ন জীবিকা, বিচিত্র কর্মপদ্ধতি, নানান জীবনযাত্রার বৈভবে শহরে দলের সুরতাল নেই। তারা সবাই বেরিয়ে পড়ে, রাতে শহর টেনে আনে আপন আশ্রয়ে—এ টুকুই মিল। তাই ক্যাডিলাকও আছে, রিক্সার ঠুং ঠাং, ঝাঁকামুটে, মিনি স্পেশাল—যে যেমন ভাবে পারে সামর্থ্যের তারতম্যে দানা-পানি খুঁটে চলেছে। দল বলি কি করে? বলা যায়, দিনরাতের ভিন্ন প্রহরে শহরের পথে ভীড় করে আবার মিলিয়ে যায়। মিলিয়ে যায় আপন আপন ঠিকানায়। আর সেটুকু যাদের নেই,—স্টেশন, ফুট, রক, ওভার-ব্রীজের গহ্বরের আশ্রয়ে যারা আছে,—তারা ফিরবে কোথায়? বলা যায় তারা বেরিয়েই পড়েছে।

রাতের শেষ ট্রামটায় প্রিয়নাথ ফিরছিল। প্রায় ফাঁকা, জানলার ধারের সিটটায় মাথাটা হেলিয়ে বাতাসের আরাম-স্পর্শ নিচ্ছিল। নবীকরণের শেষ দিন, মস্ত জালে ঢাকা পাখা, জাতীয় সম্পত্তির গুরুত্ব, কোন গ্রুপ-নাটকের নতুন প্রযোজনার বিজ্ঞাপনে চোখবোলা-নোর মামুলি কর্তব্যের পর এখন বাইরে চলন্ত আলোর বিজ্ঞাপন এবং ঘাড়, গলা, চুলে বাতাসের আরাম-স্পর্শ। সারাদিনের তীব্রতার পর দৃষ্টি ও শ্রবণ-যন্ত্র এখন ধুঁকছে। সমস্ত দিন রোদে পুড়ে গাছের পাতারা যেমন রাতের আলোকহীনতায় মৌন, শান্ত হয়ে যায়, শহরের জীবনক্ষয়ী যান্ত্রিক শব্দের অপ্রতিহত আঘাতের পর মানুষের ইন্দ্রিয়, গ্রন্থি রাত বাড়তে থাকলে মুক্তির স্বাদ পায়। এই ধুঁকতে

থাকার মধ্যেই বিশ্রাম, মুক্তি এবং ছোটখাট শব্দের মাধুর্য নতুন পরিচয়ে মানুষের অনুভূতিতে সুখস্পর্শ দেয়। ছুচারটে গাড়ির তীব্র গতি, কনডাকটরের দড়ির টানে বেলের শব্দ—ঘটাং, একটানা ছড়ের আওয়াজ, এখন এই যাত্রাপথে প্রিয়নাথকে বেমনা করে তোলে। সামনের এতগুলো সিটে কয়েকটা টাক, ঝাকড়া-চুলের এক যুবক। মহিলাদের আসনে এক মধ্যবয়স্কা। চোখের কোল, চুল এবং কাঁধে ক্লান্তির পলি।

কণ্ডাকটরটি পাশে বসল। আট ঘণ্টার ডিউটিতে এমন সুযোগ হয় না। প্রিয়নাথ পোষাকে ঘামের গন্ধ পেয়েই তাকাল। লোকটি হাসে। প্রতিদিনের যাতায়াতের পথে মুখ চেনা। কখনো ছু চারটে কথা, হাসি, চোখবিনিময়ের প্রথা প্রিয়নাথের সঙ্গে প্রায়ই ঘটে থাকে। আজও কোম্পানীর প্রশাসন, রাস্তা-খোঁড়াখুড়ির কথা ওঠে।

—কবে সব ঠিক হবে বলুন তো, সাহেব?

—কি? রাস্তাঘাট? সারবে, সারবে! মাটির তলে রেল হচ্ছে, চাট্টিখানি কথা? প্রিয়নাথ হাসে।

সামনের টাকপড়া বৃদ্ধ খোঁচা দিয়ে বলে—এরপর আকাশরেল আছে, চাই কি মেট্রোরেলের গর্ত্তে ফেরি সার্ভিসও চালু করতে পারে, ভাবছ কেন? কবে ঠিক হবে হাত গুনে বলা যায়?

—আরে বাবু, দো ঘণ্টা আজ জামে আটকে ছিলাম!

—তাতে কি? 'দিতে হবে করতে হবে'র মিছিল তো বার্থরাইট! ছু ঘণ্টা আটকে ছিলে তো কি হল?

প্রিয়নাথ তৃতীয় ব্যক্তির মন্তব্যে গুরুত্ব দিল না। ভদ্রলোকের কথার বিদ্রূপ ভালো লাগে নি। কণ্ডাকটরটিকে আস্তে জিজ্ঞেস করল—ছু ঘণ্টা? কি কারণ?

—শালা, কেউ আইন মানে? মালের লরি ঢুকিয়েছে বিকেলে—পুলিশ ভি নেই!

ভদ্রলোক উৎসাহ দেখালেন না। মহিলাটি নামলেন। ঘন্টি

বাজল, আবার চলল ট্রাম। ভদ্রলোক ধমকের সুরে বললেন—যদি পড়ে যেত? দেখে বেল দিতে হয়! নিজের ডিউটি নিজেই কর না, তায় আবার…!

—লেডিজ আমি দেখেছি। ঠিক নেমে গেছে।

—নেমে যখন গেছে, ঠিক তো হবেই, যত্তসব!

কণ্ডাকটরটি প্রিয়নাথের দিকে তাকায়, প্রিয় সামনের সিটের টাকটার দিকে। শিশিরের মত কিছু কিছু ঘামিয়ে উঠেছে। নিজেকে সংযত রাখবার জন্য অতিরিক্ত গম্ভীর। প্রিয়নাথ লক্ষ্য করেছিল ঘাড় ঘুরিয়ে কথা বলার সময় চোখের পাতা জোড়া টেনে রাখতে পারছিল না, যেন নেশাচ্ছন্ন। প্রিয়নাথ তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিতে কণ্ডাকটরটিকে চুপ করতে বলে।

ট্রামটা বেশ দ্রুত ছুটছে। চাকা ও তারের একটানা ধাতব শব্দ। স্টপেজ আসে, হিসহিসে শব্দ ক্ষীণ হয়ে যায়, আবার ঘটাং করে উচ্চ-নাদে চলতে থাকে। বড় ভালো লাগে প্রিয়নাথের। এ সময়ে ফেরার মধ্যে মনে হয় ট্রামযাত্রাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায়। কলকাতার বৈশিষ্ট্য ট্রাম—সেই ছোটবেলায় একবার শহরে এলে প্রিয়কে পাতা লাইন, টিকি, তার এবং ঠং ঠং ঘণ্টা বাজিয়ে বিছার মত এগিয়ে যাওয়া বাহনটি মুগ্ধ করত। দেশে ফিরে সমবয়সীদের সঙ্গে শুধু ট্রামের বিচিত্র, কাল্পনিক আলোচনা চলত মাসের পর মাস। কলকাতা দেখার ভাগ্য খাল-বিল পরিবৃত ওপার-বাংলার গণ্ডগ্রামের কজন শিশু বা কিশোরের ভাগ্যে জুটত? প্রিয়কে ঈর্ষা করত তার বন্ধুরা—আনোয়ার, সামসের, হিতেন, জগদীশ! কিশোর বয়সে, যুদ্ধ লাগার আগের বছর, সে প্রথম কলকাতা এসেছিল। যাক্ সে কথা। গীর্জার ঘণ্টা শুনে প্রিয়নাথ ঘড়িটা খুলে চাবি দিল। আর ঠিক তখনই শহরের অস্পষ্ট ধোঁয়াটে আকাশের কোণে চাপা মেঘের গুরুধ্বনি ভেসে এল। এই তো সবে শীত শেষ হতে চলল, এরই মধ্যে বর্ষার সঙ্কেত! মাথা নীচু করে জানলা দিয়ে তাকাবার চেষ্টা করল আকাশের ফালি-টালি দেখবার জন্য। স্পষ্ট উজ্জ্বল হয়না আকাশ এখানে, ধূলি-ধোঁয়ার ফিকে আস্তরণে

আবৃত। তবুও ভালো করে খেয়াল করল, কোন তারা দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই মেঘ করেছে এবং তারই মৃদু মন্দ ঠাণ্ডা হাওয়া।

খোকা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে, আর মঞ্জু? ইস্। ঘড়ি দেখে প্রিয়নাথ লজ্জিত হয়। শ্যামবাজারে দেরি হয়ে গেল। আর খোকা যদি অত্যুৎসাহে জেগে থাকে, নিশ্চয়ই বিলম্বের জন্ত অনুযোগ করবে। সাইডব্যাগে হাত ঢুকিয়ে সে পোটলাটা অনুভব করল। খোকার জন্য মায়া হয়। সত্যিই অনেকদিন হয়ে গেল। বাল্যকালের সামান্য জিনিষকে ঘিরে কত উৎসাহ, উদ্দীপনা! তার জীবনেও ঘটেছে, হয়ত সবার জীবনেই সত্য।

চাকা ও তারের ধাতব শব্দের মধ্যে মেঘমন্দ্র প্রিয়নাথের চেতনায় জানান দিচ্ছিল ঝড়বৃষ্টির দিন এগিয়ে আসছে। শহরের বুকে প্রলম্বিত বর্ষার এক চিত্র-কল্প ফুটে উঠতে থাকে। জল ঠেলে লেবুর খোসা, শালপাতা, সিগারেটবাক্স, ফিলটারের অংশ, পোড়াকাঠি, ন্যাকড়া, ডাবের খোল-ভাসা ঘোলা জল ঠেলে প্যাণ্ট, ধুতি, সায়া-শাড়ি কাছিয়ে চলেছে সবাই। টাল-মাটাল অবস্থায় মন্থর গতিতে ডবল ডেকার, প্রাইভেট, ট্যাক্সি, মিনি চলেছে লাইন দিয়ে—ঘোলা জলের ঢেউ ফুট ভাসিয়ে দোকানের গায়ে ধাক্কা খায়। কোমর ডুবিয়ে রিক্সাওয়ালা ঠেলে চলে কোন মোটা পুরুষ মহিলা নিয়ে, ছাতি আর মাথায় রুমাল ফেলে মানুষ তাকায় দলা দলা মেঘাক্রান্ত আকাশের দিকে। কোথাও খোলা ম্যান-হোলে ঘূর্ণির স্রোত—লাল সংকেতে বিপদ-চিহ্ন। হর্নের চিৎকার, ডিপোয় ট্রাম ঝিমোয়। রাস্তার যে অংশে জল জমে না, চাপে পিচ আর খোয়া উঠে বড় বড় খোদল হয়ে গেছে, বাস ট্যাক্সি ঝাঁকুনি খেয়ে কর্কশ আওয়াজ করে ওঠে আর কলকাতার কিছু এলাকা এই জলের জন্য বিখ্যাত হয়ে গেছে—ঠনঠনে, জগুবাবুর বাজার, চারুমার্কেট! এইসব দিনে প্রিয়নাথের একটা অদ্ভুত শখ মাথা চাড়া দেয়। ঘোলা জলের মধ্যে মধ্যে যেখানে রাস্তার ট্যাপ সামান্য মাথা উঁচিয়ে সরু ধারায় নির্মল জল মিশিয়ে দিচ্ছে, হাঁ করে প্রিয়নাথ দেখে ভারি মজা এবং শিহরণ জাগে।

এখন, এই বিচ্ছিন্ন চিন্তা ভাবনার মধ্যে ট্রাম-জানলার ফাঁক দিয়ে চলন্ত ঘরবাড়ির দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ল নিজস্ব ঠিকানা—টু-বি কাকুলিয়া রোড। ইটের খাঁজে খাঁজে সুরকির ধুলো, জানলার শক জংয়ে ক্ষয়ে গেছে, পুরোনো আমলের কড়ি-বর্গার ছাদে ফাটল। দিনরাত কাঠের বর্গার ঘুণ বাতাসে ঝরে পড়ে। এই মেঘমন্দ্র এবং ঠাণ্ডা বাতাসে কানিশের সবুজ, বাড়ন্ত বট গাছটির মাথা-দোলানিতে সে ঝড়ের পূর্বাভাষ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করল। এ সব ভাবনা তার বিশেষ আসে না, বিশেষ করে রাস্তায় নামলে বাসার কথা ভুলে যায় সে। কিন্তু এই অলস মুহূর্তে পোটলাটা ছুঁয়ে খোকার কথা মনে উঠতেই ভীড় করল মেঘমন্দ্র এবং আনুষঙ্গিক চিন্তা। এই বর্ষার দিনগুলোতেই যত সাংসারিক টানাপোড়েন, মঞ্জুর সঙ্গে মন কষাকষি, বাবার আস্ফালন—মনে হয় পারিবারিক ভারসাম্যই বেতাল হয়ে যায়। দুরারোগ্য ব্যাধির মত ভাবনাটাকে প্রিয়নাথ বাইরের হাজার চিন্তায় ভুলে থাকতে চায়। তবু মন বলে কথা!

কখন যে গড়িয়াহাট মোড় চলে এল খেয়াল করেনি।

—চলি ভাই, আবার কাল দেখা হবে।

—কাল নয়, আমার মর্নিং সিপ্ট। বলা যায় না, বাবুদের মর্জি।

লোকটি চোখের পাতাজোড়া ফাঁক করে মাথা নাড়ায়, গোঁফের আড়ালে ঠোঁট নড়ে, আলগা দড়িতে টান পড়তেই ঠং ঠং মৃদু শব্দে গাড়িটা এগোয়। প্রিয়নাথ দেখে তারে নীল স্পার্ক। রাস্তা পেরিয়ে চলে আসে বাঁ ফুটে।

অভিজাত অঞ্চলের ব্যস্ততম এলাকাটা এই অধিক রাতে কেমন অপরিচিত। কে বলবে সমস্ত বিকেল সন্ধ্যা রাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত এখানে স্ত্রী-পুরুষের অনর্গল স্রোত তাড়ির হাঁড়ির ফেনার মত উপচে থাকে। শাড়ি, জিনস্-এর খস্ খস্, ল্যাভেণ্ডার ডিউর সুগন্ধ, সোনা বা ইমিটেশনে আলোর ঝলক, মাইফেয়ার লেডি ও ব্লু স্টার-রঞ্জিত বিচিত্র ঠোঁটের বিজ্ঞাপন, মুক্তোর মত কলগেট দাঁতের হাসি, ওয়েসিস মাখা ফুরফুরে চুল, ঝুড়ি-খোঁপা কিংবা নিকেলের চশমার

আড়ালে মেয়েলি যুবকের ভাবগম্ভীর চোখ—স্রোতে ভাসমান ফুলের মতো এগিয়ে চলেছে। দোকানপাট তো আছেই! ঘড়ির কাঁটা যে টিক্ টিক্ এগিয়ে যায় এখানে বোঝা যায় না। এই অধিক রাতে এলাকাটা তাই অপরিচিত। মনে হয় স্রোতের জল চলে গেছে, ভেসে যাওয়া তারা-ফুলেরা নেই, জেগে উঠেছে কাদা-মাটি-পলির স্পর্শ।

প্রিয়নাথ এই অধিক রাতের পরিবেশে অভ্যস্ত। প্রায় প্রতিদিনই এ সময় ফেরে সে। স্বল্প প্রচারিত দৈনিকটার সংবাদগুলো গুছিয়ে, হেডলাইন ঠিক করে, মেশিন-ম্যান, কম্পোজিটারদের সঙ্গে কথা বলে বেরোতে রাত হয়।

প্রিয়নাথ ছোট ছোট পদক্ষেপে এগোচ্ছিল। বড় বড় হোর্ডিং-গুলো কেমন নিষ্প্রভ, রাস্তার মস্ত মার্কারি আলোগুলো রহস্যময়। কেউ কেউ ফুটের উপর টুকটাক আপন কাজে ব্যস্ত দু চারটে সিগরেট, পান, থামস্ আপের দোকান খোলা। সেইসব দোকানগুলো—সকালসন্ধ্যায় যারা আধুনিকতার প্রতিভূ হয়ে সেজেগুজে থাকে সাটারে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। ফিকে অন্ধকার জমে আছে তাদের সিঁড়িতে। আর গলির মোড় এবং ঐ সব সিঁড়িগুলোতে কিছু অলস মানুষজন; একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে অধিকাংশের চোখ নেশার দ্যুতিতে উজ্জ্বল। কেউ সিগরেট টানে, পান চিবোয় কিংবা দু চারটে মেয়েপুরুষের উৎকট পোষাকের বেআব্রু চলা-ফেরায় চোখজোড়া আঠার মতো লাগিয়ে দেয়॥

সামান্য এগিয়ে, সকালে যেখানে দক্ষিণের সব্জি-ব্যবসায়ীরা ভীড় করে, ছাড়িয়ে যেতেই দাশ কেবিন।

প্রিয়নাথ উঁকি দেয়। চেয়ারগুলো উল্টে গাদা করা. ছোকড়া-গুলো ঝাঁটা জল দিয়ে মেঝেটা পরিষ্কার করছিল। কাউণ্টারের কোণে মালিক শীতল দাস ঠোঁটে নিভন্ত বিড়িটা ঝুলিয়ে ক্যাশ গুনছিল। কালো থলথলে চেহারা, কাঁচা-পাকা ব্যাকব্রাশ করা চুল। প্রিয়নাথের ছায়াটা দেখেই একগাল হেসে বলে—আইজ আর চা হইবো না। এত রাত করলা দাদা?

—তোমার কি চরিত্রদোষ হলো, শীতল? সন্ধ্যারাতেই বাসায় ছুটছ?

—ঘড়িটা তো সঙ্গে আছে? এখনও তোমার সন্ধ্যারাত?

—নাঃ, তোমাকে নিয়ে চলবে না। এ জন্যই বিপ্লব হল না দেশে।

—চা না হউক, একটু বসো। খবরটবর শুনি। বাড়িতে মাইয়াটার জ্বর, নইলে তোমার চা খান রাখতে পারতাম!

প্রিয়নাথ এখানে রাতের শেষ কাপ ঠোঁটে তোলে। আজ প্রায় পনের-বিশ বছর ধরে এই অভ্যেস। যখন যেখানেই থাকুক না কেন, দাশ কেবিন হল আড্ডার শেষ আশ্রয়। অনেকেই প্রিয়নাথের সান্নিধ্যের জন্য কাজ-কম্ম সেরে রাত গড়ালে টুকটাক হাজির হয়। কন্‌ট্রাক্টর, খুদে ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, দু চারজন কবি—ছোটখাট একটা পরিমণ্ডল আছে দাশ কেবিনের, প্রিয়নাথ যার কেন্দ্রস্থল। দাশ কেবিনের মালিক শীতল দাস বয়সে প্রিয়নাথের দু চার বছরের বড় হলেও, বড় অনুগত ভক্ত। কাকুলিয়ার পিছনে রেললাইনের বস্তির ধারে থাকে সে। শীতলকে রাজনীতি-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিল প্রিয়নাথ—তাই গুরু। এক পয়সার ট্রাম আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন মিছিল-মিটিং, খাদ্য-আন্দোলনে শীতল ছায়ার মত প্রিয়নাথের পাশে থাকত। তা ছাড়া পঞ্চাশের দশকে এই অনুন্নত অঞ্চলটা নিয়ে প্রিয়নাথ, বাবা আদিনাথ যখন খুব খাটাখাটুনি করত—স্কুল গঠন, ড্রেন পরিষ্কার, বস্তীবাসীদের স্বাস্থ্য—প্রজাতন্ত্র এবং স্বাধীনতা দিবসে বিনিপয়সায় স্লেট, বই, দুধ পাউরুটি বিতরণ—শীতল ছিল অন্যতম সহকারী। কত-উত্তেজনায় রাত কাটিয়েছে একসঙ্গে! কলকাতায় ট্রাম-বাস পোড়া এবং গুলি-চালনা তো কম হল না। ষাটের দশকের পর অবশ্য থিতিয়ে গেছল উত্তেজনা। বয়স বাড়ছিল, পরিবার আছে, অনেক ব্যক্তিগত সমস্যায় শীতল পিছিয়ে পড়েছিল। দিন-কাল যে এত দ্রুত পাল্টে যাবে বোঝে নি। প্রিয়নাথের পরামর্শেই এখানে চায়ের দোকান দিয়ে-ছিল শীতল। এ পাশটা তখনও অভিজাতের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেনি।

খাটাল জলা বস্তী—সবে সুরম্য বাড়িঘরের চাপ বাড়ছে। সন্ধে ন'টার পর আড্ডা জমত না। আস্তে আস্তে ভূগোলটা পাল্টে যেতেই ছোট্ট চায়ের দোকান আজ কেবিন। গাড়ি থামিয়ে মেয়ে-পুরুষ এ দোকানের মোগলাই খেয়ে যায়। প্রশস্ত পরিসর নেই যদিও, তবু ঠাসাঠাসি চেয়ার টেবিলে সারাদিনরাত ভীড় কম থাকে না। কালো টিনের পাতে মেনু ও দামের লিষ্ট টাঙ্গানো।

আজ জীবনধারায় সেই পুরোনো দিনগুলো হারিয়ে গেলেও, অধিক রাতের অড্ডার আমেজটুকু ধরে রাখার চেষ্টা চলে। সেদিনের সঙ্গী-সাথীরাই আজ কেউ কনট্রাক্টর, অধ্যাপক, কবি, ছোটখাট ব্যবসায়ী। প্রিয়নাথের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা সমান। গুছিয়ে নেয় নি সে, আজও অনিশ্চিত ভবিষ্য-সমুদ্রে জীবিকার ছোট্ট ডিঙ্গি ভাসিয়ে যাচ্ছে। কখনও ছোট সাহিত্য পত্রিকায়, কি মিশনারি সংগঠনে, কি প্রকাশকের উপদেষ্টা—নানা ঘাট ঘুরে বছরখানেক হল স্বল্প প্রচারিত এক দৈনিকে যোগ দিয়েছে।

—তা মেয়ের জ্বর, মানে ম্যালেরিয়া নাকি ?

—কি জানি। শুনি ম্যালেরিয়া নাকি আসছে। ডাঃ নন্দীরে তো কল দিছিলাম। শুনি গিয়া বাসায়।

—বাব্বা! এক লাফে নন্দী! তিরিশ না বত্রিশ? তা ভালো, পচা ডিম আর ডিজেল খাইয়ে ওদের পকেট কাটবে; আবার দেবেও ওদের।

—কি যে বল তুমি! শীতল হাসে। একটা সিগরেট এগিয়ে দিয়ে বলে—নাও, চা নাই, চারমিনার আছে! তোমার যন্ত্রে আজ কি খবর আসছে ?

—মেঘ জমেছে, বাসায় যাও, খবর কাল শুনবে।

সিগরেটটা ধরিয়ে এগোতে গিয়েই শোনে—প্রিয়দা।

কবি অধ্যাপক তথাগত মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলে—ভাবলাম দেখে যাই আছেন কিনা। চা খাবেন! প্রিয়নাথ বক্তৃতার ভঙ্গিতে মুখটা তুলে বলে—এতরাতে মেয়েছেলে ধরতে বেরিয়েছ ?

দাস হো হো করে হাসে, তথাগত লজ্জায় কাঁচুমাচু হতেই প্রিয়নাথ বলে—আহাঃ লজ্জার কি! পৃথিবীর কোন কবি-সাহিত্যিক এটা করেনি? প্যারিসের বেশ্যাখানায় না গেলে মঁপাশার লেখাই হত না। শেলি, কীটস্, বায়রন! অন্তত মাল-ফাল তো টানবে?

—কি যে বলেন! তথাগত লজ্জা পেতেই আকাশ গুড় গুড় করে ডেকে উঠল।

—বাসায় যাও, কাল কথা হবে। প্রিয়নাথ এগিয়ে যায়। ইস্ সে নিজেই কিছুটা সময় খেয়ে ফেলল?

গোলপার্ক ছাড়িয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে বেশ কিছুটা চলার পর প্রিয়নাথের নিজস্ব গলি। দোতলা এক বাড়ি থেকে ডিস্কো মিউজিকের শব্দ আসছিল। আজকাল শহরে নাকি সঙ্গীতে বিপ্লব ঘটে গেছে। রক্ এ্যাণ্ড রোল, পপ সং সব ব্যাকডেটেড—পুরোনো। মোড়ে মোড়ে স্টিরিওর দোকানে ড্রামবাজানো শব্দে মিউজিক হয়, জিন্‌সের প্যাণ্ট পরা, জ্যাকেটের মতো গেঞ্জি গায়ে, দুপাশে পাতলা বিনুনি, মাউথ পিস হাতে একটি তরুণীর ছবি মৃদু হাসি ফুটিয়ে রাখে। নাজিয়া হাসান! লণ্ডনের ষোল বছরের একটি মেয়ে তুল-কালাম কাণ্ড করে দিচ্ছে। গ্রামো-রেকর্ড কোম্পানীগুলো নাকি কামাচ্ছে লাখ লাখ টাকা, পেয়ে গেছে সোনার খনির সন্ধান। প্রিয়নাথকে এত খবর দিয়েছে পত্রিকা অফিসের স্বপন। ছোড়াটা যাত্রা-থিয়েটারের সমালোচনা করে, আর কলকাতার আধুনিকতম সংবাদ তার নখদর্পণে। একদিন রাস্তায় আসতে আসতে হঠাৎ একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল—প্রিয়দা, মিউজিকটা শুনুন! নাচতে ইচ্ছে করছে না? ডিস্কো! নতুন এসেছে। ঐ, ঐ যে মেয়েটা, নাজিয়া হাসান!

আজ এখন হঠাৎ ঝিন্-চাক্ শব্দে তার খেয়াল হল। কিন্তু চাপা গরম, আকাশে একটিও তারা নেই, বাতাস থমকে গেছে। বাসার জন্য দ্রুত পা চালানো দরকার।

বাসার গলিতে ঢুকে পড়লে বোঝা যাবে না প্রিয়নাথ কলকাতার

অভিজাত এলাকার অধিবাসী! বাড়িঘর, চওড়া রাস্তাঘাটের ঘেরাটোপে এখনও যে প্রাচীন কিছু নিদর্শন লুকিয়ে আছে কে অনুমান করতে পারে! হয়ত উন্নতির এটাই ব্যতিক্রম। সব এলাকাতেই হয়তো এমন হয়। বিগত কয়েক বছরে ভৌগোলিক উন্নতির ঘোড়াটা এখানে হঠাৎ থমকে গেছে। চারদিকের ইট কাঠ কংক্রীটের মধ্যে এক-ফোটা পুরোনো ইতিহাস মিউজিয়মের দর্শনীয় বস্তু হয়ে আছে। প্রিয়নাথ বোঝে ঘোড়াটা এখানে থমকে গেছল রক্ষে, নইলে!··· চিন্তাটা সে প্রায়ই ধামা চাপা দেয়। গলিটার বাঁ দিকে অবশ্য বছর দুই হল কয়েকটা পেল্লাই বাড়ি উঠেছে। মাথার উপর অ্যান্টিনার রূপোলী জট রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে ঝকঝক করে। নেমপ্লেট আছে—মিঃ শূর, এ্যাডভোকেট! বি ঘোষ—ইঞ্জিনিয়ার! এই সুউচ্চ বাড়ি-গুলোর ছায়ায় সুরকি ঢালা গলিটা বারোমাস স্যাঁতসঁ্যাতে। ডানে বাঁক নিলে ঘাস, শেওলা, ছোট ছোট বনতুলসীর ঝোপ এবং কয়েকটা টিন ও টালির চালা। মাটির দেয়াল কিংবা পুরোনো আমলের ইটের কিছু স্তূপ, পিছল উঠোন। পেয়ারা গাছ আছে, গোবর আর ভাঙ্গা ইটকাঠের স্তূপ। রাতে টিমটিমে লম্ফ জ্বলে, ছেলেমেয়েগুলো চেঁচায়, মার খায়, মলিন বেশ-বাসের মহিলাদের লাজুক দৃষ্টি যে কোন নতুন পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আদি কলকাতার বেন্টিং স্ট্রিট বা চৌরঙ্গীর নেটিভদের কুঁড়ে-বস্তীর মত। সেকালে ঐ সব বস্তীতে হৈ চৈ লেগেই থাকত, এখানে অবশ্য নানান আভিজাত্যের দাপটে এরা নিঃশব্দে স্তিমিত জীবনধারা বহন করে চলে। একটু এগোলেই প্রিয়নাথদের হেলানো একতলা বাসাখানা।

২

ফাটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথ কড়া নাড়ল। ভিতরে আলো জ্বলছে। বারান্দায় পঁচিশ পাওয়ারের একটি অপরিষ্কার বাল্ব। প্রিয়নাথ দেখে বারান্দার প্রান্তভাগে লম্বা ঘাসের ডগা উঁকি দিচ্ছে। দেয়ালে পেন্সিলের মস্ত এক মাছের ছবি—নিশ্চয়ই খোকার কাণ্ড। এ ছাড়াও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে খোকার কল্পনার ছাপ। ছোট্ট কাঠের প্লেটটায় রং চটে গেছে—পি. এন. রায়। 'ইন্' শব্দটির গায়ে কাঠের টুকরোটি চেপে থাকায় 'আউট' শব্দটি ফ্যাক ফ্যাক করে আছে, প্রিয়নাথ আস্তে সরিয়ে দেয়। আগামীকাল এগারোটা পর্যন্ত টুকরোটা 'আউট' শব্দটিকে চেপে থাকবে।

হঠাৎ বাতাস উঠল। মঞ্জু দরজা খুলে সরে দাঁড়াল। অন্যান্য-দিন শাড়ির খুটে মুখটা মুছে সামান্য হাসে। আজ ভুরুজোড়ায় সামান্য বিরক্তি।

—কিছু কেনার থাকলেই রাত করে ফেরো, আমরা মানুষ না কি? শরীর মন নেই!

—খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে! সেকি! প্রিয়নাথ হালকা হাসির রেখা টানল। চটিটা ঠিক স্থানে রেখে সাইডব্যাগটা দেয়ালে ঝুলিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে প্রিয়নাথ এমন করতে লাগল যেন রাত তেমন হয়নি।

—কতক্ষণ জেগে থাকবে? এগারটা পর্যন্ত তাকিয়ে ছিল জানলা দিয়ে। ছেলেমানুষ শখ আহ্লাদ তো আছে?

—ভাবলাম স্কুলের ড্রেসতো. রাতে কি আর দেখবে? কাল পরে গেলেই হবে।

এ কি আমরা? দরকার হলে পরলাম? ওদের ঘাটাঘাটি গন্ধ শোঁকা এতেই আনন্দ! এটা না বুঝলে চলবে কি করে? যাক হাত পা ধুয়ে নাও। গড়িয়াহাটা কি সতের মাইল দূর?

চৌকির মশারির মধ্যে খোকা ওমুখো হয়ে গুটি পাকিয়ে আছে। দুটো বেড়াল এসে প্রিয়নাথের পায়ের কাছে ম্যাওটাতে থাকে। সন্তান স্নেহে প্রিয়নাথ এদের পালন করে, অসুখে ওষুধ দেয়, আদরে নরম তুলোর শরীরে হাত বুলোয়, বই পড়তে পড়তে কোলে তুলে নেয়।

মঞ্জু চলে গেল ভিতরে। জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে প্রিয়নাথ মনে ভাবে মঞ্জুর কথা, গড়িয়াহাট মার্কেট! বাব্বা! আমি তো···! মঞ্জুকে সে বলেনি। কোনদিনই ভেঙ্গে বলে না। আজ সে খোকার পোষাক কিনতে শ্যামবাজারে গেছল। তার পরিচিত দর্জি ছোটখাটো দোকান দিয়েছে। পঁয়ষট্টিতে পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধের পর, বাংলা দেশ থেকে চলে এসেছিল। কিছু জোটাতে পারেনি, ছোট দোকান-টায় সাত সাতজনের মুখের গ্রাস সংগ্রহ করে। এই দোকানঘরটি পাইয়ে দেয়ার পেছনে প্রিয়নাথের অবদান ছিল। তাই সামান্য সস্তায় যত্ন নিয়েই সে প্রিয়নাথেব কাজ করে দেয়। মঞ্জু জানে না, শুধু পোষাক নয়, বাসার যে কোন টুকিটাকি, ওষুধ, তেল, সামান্য প্রসাধনী, জামা-কাপড় কিনতে প্রিয়নাথকে কত মাথা খাটিয়ে, পরিশ্রম করে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে হয়। গড়িয়াহাট এখন প্রিয়নাথদের মত মানুষদের নাগালের বাইরে। এটা বেশিদিনের কথা নয়, বছর দশ পনেরর মধ্যে নিঃশব্দে কোথায় যেন ভয়ানক ওলটপালট হয়ে গেছে। দীর্ঘ তিরিশ বছরের অধিক এখানে বাস করে মনে হয় তারা পরবাসী। এ নিয়েই মঞ্জুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে হয়। মেয়েরা অবুঝ! কিংবা অবুঝই বা বলে কি করে, মঞ্জুর মত মেয়ে না হলে কবে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যেত!

আচমকা লাফ দিয়ে উঠল খোকা। গোঁজা-মশারি তাড়াহুড়োয় তুলতে গিয়ে মাথা-মুখে জড়িয়ে যায়, ধ্যাৎ ধ্যাৎ বলে—দু-হাত-পা ছুঁড়ে মেঝেতে দাঁড়িয়েই হাসে। অবিন্যস্ত চুল, চোখজোড়া ঈষৎ ফোলা। প্রিয়নাথ এই প্রথম লক্ষ্য করল গালে, নাকের ডগায় দু-চারটে ব্রণ উঠেছে খোকার।

—কিরে, ঘুমিয়েছিস বলে? মা বলছিল?

—হ্যাঁ। জেগে উঠলাম তোমাদের কথাবার্তায়। আমার ড্রেস?

—রাতেই লাগবে তোমার? কাল সকালে যদি কিনে আনি? প্রিয়নাথ রসিকতা করে। প্রতিদিন সে গম্ভীর হয়ে বলত, হবে, হবে ব্যস্ত কিসের? আজ বাবার স্বরভঙ্গিতেই খোকা রহস্যটুকু ধরে ফেলেছে। সে উন্মত্তের মতো এধারওধার তাকিয়ে ছুটে গেল পেরেকে ঝোলানো সাইডব্যাগটার কাছে। আঙুলের ডগায় ভর করে গোড়ালি তুলে সটান হাত ঢুকিয়ে পোটলাটা বার করে আনতেই কেমন হাসির ঢেউ খেলে গেল তার মুখে—ইস্, কাল সকালে কিনে আনবে! প্রিয়নাথের মনে হলো খোকার মুখের আদল নাকের সীমা পর্যন্ত তার নিজের মত। কপালটি ছোট, উজ্জ্বল, চোখজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত, নাকের মাথাটিতে একই ধরনের ভাঁজ; তবে ঠোঁট আর থুতনি যেন অবিকল মঞ্জুরটা বসিয়ে রেখেছে। খোকা—দেবনাথ রায়, তার একমাত্র সন্তান। উনিশশো উনসত্তর সাল—দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টের পতনের দিন জন্মেছিল। মা তৃমঙ্গল থেকে মঞ্জুকে আনতে সেদিন কোন যানবাহন ছিল না, চারদিকে অনিশ্চিত বিশৃঙ্খলা। বাধ্য হয়ে গলির মোড়ের মিঃ শূরের কাছে গাড়িটি চাইতে ওনার স্ত্রী হাসতে হাসতে বলেছিলেন—সত্যি অসুবিধে আপনার! ডেলিভারি কেস বলে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না? উনি এগুলো পছন্দ করেন না, প্রিয়বাবু!

এই সেই খোকা, অধিক বয়সের সন্তান, দেবনাথ রায়।

কাগজের মোড়কটা শক্ত টন-সুতোয় বাঁধা। ধীর-শৃঙ্খলায় খুলবার অবকাশ নেই। টেনে হিঁচড়ে, কাগজগুলো ফড় ফড় করে ছিঁড়ে খোকা জামা প্যাণ্টটা বার করার চেষ্টা করে।

—আস্তে! সব কিছুতেই বিশৃঙ্খলা। এ অভ্যেস ছিলো না তো? গিঁট খুলতে হয় আস্তে।

—ছাই! কি যে বাঁধে।

দু হাতে জামাটা ধরে চোখের সামনে মেলে ধরল। সাদা হাফ শার্ট এবং খাকি প্যাণ্ট।

—টেরিন ? কি কোম্পানি ?

—জানিনা।

নতুন পোষাকের গন্ধ লাগছে খোকার নাকে। মঞ্জু পাশে দাঁড়িয়েছিল, তারও। গন্ধটা ভাতের মাড়ের মতো সোঁদা সোঁদা, নাকে মন্দ লাগে না। কিন্তু টেরিন বা টেরিকটের কি গন্ধ আছে ? আর তেমন ধবধবেও বা কই ? তার ক্লাসের ছেলেরা যখন পরে কেমন মিহি ঝিলিক খায়, বেঞ্চগুলো উজ্জ্বল হয়ে থাকে। প্যাণ্ট-গুলো অদ্ভুতভাবে ফুলন্ত থাইয়ে চেপে থাকে। এই নতুন কাট্‌কে কি যেন বলে ? খোকার জানা ছিল না। মিঃ শূরের বাড়ির টুকাই—ওরই সহপাঠী—মুখ টিপে হেসে ওর অজ্ঞতাটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। বাবাকে বলব বানিয়ে আনতে—খোকা হাসির অপমানটুকু হজম করেছিল স্বাভাবিক হবার চেষ্টায়। টুকাই বলেছিল—তাই নাকি ? ওর কিন্তু অনেক দাম ! অন্যান্য সহপাঠীরা সামান্য হেসে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছল।

চোখের আড়াল থেকে জামা প্যাণ্টটা নেমে এল। মুখটা গম্ভীর। আঙ্গুল দিয়ে শেষবারের আশা নিয়ে জমিন পরীক্ষা করতেই, নাকের পেটিজোড়া ঈষৎ কাঁপল, বেঁকে উঠল ঠোঁটের রেখা। মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত মশারি খাবলে বিছানার ভিতর পুটলি মেরে দেয়ালের দিকে মুখ করে রইল।

—ফেলে দিলি যে ? প্রিয়নাথের কপালের রগটা শাখা-প্রশাখায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

—ও আমি পরব না।

—কি পরবি না ? এদিক ফিরে কথা বল !

খোকা ফেরে না। মঞ্জু এগিয়ে জামাপ্যাণ্টটা সযত্নে গুছিয়ে রেখে আস্তে অনুরোধ করে —ছেড়ে দাও, সেন্টিমেণ্টে লেগেছে, পরে ঠিক হয়ে যাবে।

—কিসের সেন্টিমেণ্ট ? প্রিয়নাথ ক্ষুব্ধ হলে গলার স্বর উচ্চকিত হয় না। ভারি, কাটা-কাটা ভাবে কথা বলে। মঞ্জু জবাব দিতে

সাহস পায় না। প্রিয়নাথ চশমাটা খুলে মঞ্জুকে উদ্দেশ্য করে বলে, কোন সেন্টিমেন্ট নয়, এগুলো ধ্বংসের রাস্তা!

—দেখছে চারদিকে, ওর কি দোষ?

—মঞ্জু! প্রিয়নাথের ছোট্ট ডাকটুকু যেন অনুক্ত নিনাদ। মঞ্জুর ক্ষমতা নেই রা কাটার। ইতিমধ্যে ওপর থেকে বৃদ্ধা মায়ের বেতো দেহটা প্রিয়র চোখের সামনে দিয়ে—পারিস বাপু, তুই। বলে মশারি তুলে ঢুকতেই প্রিয়নাথ দেখে হঠাৎ খোকার পিঠ, কাঁধ কেঁপে কেঁপে ও ভেঙে পড়তে চাচ্ছে, শপ্ শপ্ বালিশ-চাপা শব্দটা হেঁচকির মত উঠে আসছে:

—খেতে এস। মঞ্জুর এইটুকু ডাকেই প্রিয়নাথ উঠে যায়। শপ্ শপ্ শব্দটা তীরের মত বুকে বাঁধছে। খুব খারাপ লাগছে প্রিয়নাথের। কিন্তু এগুলো গুরুত্বপূর্ণ—ভাবতে ভাবতে সে হাত পা ধুতে যায়।

খেয়ে দেয়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করে তবে মুক্তি। বিছে, চামচিকে ছুঁচো, কুচিব্যাঙ—যাবতীয় প্রাণীর দৌরাত্ম্য এই ঘুপসিটুকুর মধ্যে। দিনেও জমাট আঁধার সরে পরে না। আজ ঝি আসছে না চার দিন হলো। বহু কষ্টে লাইনের ওপারের বস্তির একটি বাচ্চা মেয়েকে ঠিক করা হয়েছে, সে বেটিও টালবাহানা শুরু করেছে। এসব বাড়িতে ঝি থাকতে চায় না। মঞ্জু তাই ঘর-দোর ঠিকঠাক করে, উনুনটা পর্যন্ত সকালের জন্য ঘুটে কয়লায় সাজিয়ে রাখে। ভোরেই চা দরকার। শ্বশুর সকালে ওঠেন, প্রিয়র বিছানায় চা খাওয়ার অভ্যেস। স্টোভটা জংয়ে মাসতিনেক হলো ফুটো হয়ে আছে, তেল পড়ে একশা। এই দুর্মূল্যের বাজারে কেরোসিন নষ্ট করা যায় না। নতুন স্টোভের দাম অনেক, প্রিয়নাথকে বলে বলেও কেনান যায় নি। মঞ্জুর রাতের খাটনি বেড়েছে। প্রিয় অবশ্য সাহায্য করে এ সব কাজে। শুতে শুতে তাই রাত হল আজ এবং ঝড়বৃষ্টি তখন শুরু হয়ে গেছে। বিছানায় বসেই ওরা টের পেল, জীর্ণ দরজা জানালায় খট্ খট্ প্রবল আঘাত। বর্শাফলকের মত ধেয়ে আসছে বৃষ্টি। প্রিয়নাথ আর বই নিয়ে বসল না, মনটা কেমন খিচ্ মেরে গেছে।

আলো নিভিয়ে, বিছনায় ঢুকতেই ও-ঘর থেকে বাবার চাপা আওয়াজ শোনা গেল—প্রিয় ! ও প্রিয় !

—বাবা ডাকছে মনে হয় ? আলোটা জ্বালতেই মঞ্জুর কপালে বিরক্তির ভাঁজ। সে যেন বিষয়টা আঁচ করতে পেরেছে।

—প্রিয় কি করবে ? একটু হলেই প্রিয় আর প্রিয় ! মানুষের যেন বিশ্রাম নেই ! মঞ্জু এমন উচ্চকণ্ঠে গজ গজ করে উঠল, নির্ঘাৎ ও ঘরে কথাগুলো চালান হয়ে গেছে।

—চুপ করবে ? প্রিয় ধমক দেয়। মনে হয় মঞ্জু কোন কিছুর সীমানা লঙ্ঘন করেছে। যতই বিরক্ত হোক, বৃদ্ধ আদিনাথকে ছেলে কিছু বলতে সাহস পায় না। এ ভাবেই সে এতটা বয়স পেরিয়ে এসেছে। মঞ্জুর তা বোঝা উচিত। নইলে কিসের শিক্ষা, কিসের মূল্যবোধ ? মঞ্জু কিছু ব্যক্ত করল না, সজোরে চাদরটা গায়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে সটান হয়ে রইল। খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। পা জোড়া সোজা করে বালিশে মাথাটা ঠিক করে দিল।

ও ঘরে আগেই আলো জ্বলেছিল। খট্ করে পার্টিশন-দরজার ছিটকিনি খুলে ঢুকতেই দেখে চৌকিতে মশারির মধ্যে বাবা মা বসে আছেন।

—ভিজে গেলরে সব ! বইগুলোর ব্যবস্থা কর আগে। ইস্ ! আদিনাথ বইগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন। সমস্ত ঘরে একটা চৌকি, দুটো বিলিতি আমলের পুরোনো ট্রাঙ্ক এবং রথের মেলায় কেনা সস্তা দরের একটি আলনা ছাড়া, সারা ঘরে বইয়ের স্তূপ। ছোট খাট পিলারের মতো, ইট বা কাঠের টুকরোর উপর বইগুলো সাজানো। এককোণে বইঠাসা দুটো আলমারি। আলমারিদুটোর অর্ধেক পাল্লা কব্জা খসে পড়ায় টুকরো টুকরো ভেঙ্গে বইয়ের স্তূপ রাখা হয়েছে। ড্যাম্প ধরবে না, উইয়ে খাওয়ার ভয় নেই। তবে রূপোলী একধরনের শুঁড়অলা পোকা আছে—'বুক ওয়ার্ম', পৃষ্ঠা কুড়ে কুড়ে ঝাঁঝরা করে দেয়। আদিনাথ প্রায়ই দু চার আনার তামাকপাতা কিনে র‍্যাকে ভরে রাখেন কিংবা টুক টুক করে হাঁটতে হাঁটতে লাইনের

ধারে বাঁধানো নিমগাছটা থেকে অনুরোধ করে পাতা পাড়িয়ে বইয়ের মধ্যে রেখে দেন। এ তার কাছে দারুণ সমস্যা। দিন যত যাচ্ছে, বইয়ের স্তূপ সারা ঘরখানার ফাঁকা স্থান দখল করে চলেছে। এই বইয়ের অলিগলির মধ্যে ছোট বোন কল্যাণীর বিছানা। বেচারী ফ্যানের হাওয়া পায় না, জানলাও বিশেষ নেই, তাই প্রিয়নাথ ধার করে নীল রংয়ের নাইলনের মশারি কিনে দিয়েছে। বাবার চৌকির কাছাকাছি ফ্যানটার হাওয়া তবু কিছু ঢুকবে।

আলো জ্বালানো এবং বাবার চেঁচামেচির শব্দে উঠে বিছানায় বসেই নিঃশব্দে ছাদের ফাটলের দিকে তাকিয়েছিল। তার রুক্ষ, স্রস্ত চুল কপালে এলানো। ভাঙ্গা খোপাটা ঠিকঠাক করে সারা ছাদটা সে জরিপ করতে থাকে। চাপড়া খসা, ফাটল অসংখ্যই আছে। তবে বিছানা বরাবর এঁকেবেঁকে, সরু শাখাপ্রশাখা নিয়ে ফাটলটা যেন গভীর হয়ে গেছে, জলের ঠাণ্ডা ফোঁটাগুলো মশারির চালে পড়ে ছিটকে যাচ্ছিল বিছানায়। কল্যাণী লক্ষ্য করে আলোতে মাঝে মাঝে জলের ফোঁটা চক চক করে। বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে দু একটা বইয়ের স্তূপই জলের আক্রমণস্থল। এমনিভাবে চললে ফোঁটাগুলো ধারা হয়ে মেঝেতে গড়িয়ে অনেককিছু নষ্ট করবে।

কল্যাণী আর প্রিয়নাথ ধরাধরি করে আক্রান্ত বইয়ের স্তূপগুলি কৌশলে সরিয়ে, শতরঞ্জির টুকরো বা চটে ঢেকে রাখল। এই টুকরোগুলো চৌকির নিচে আদিনাথ যত্ন করে রাখে। মাঝে মাঝে নীরজাদেবী হাত দিলে বলে—আঃ, সবকিছুই কি তোমার সংসারে লাগবে! ওগুলো দিয়ে বই ঢাকি।

—নেইনি বাপু, নেইনি। কি অমূল্য ধন!

—তৃণ হতে কার্য্য হয় রাখিলে যতনে, তোমরা তো জীবনে কোন কথাই প্রয়োগ কর না।

—কতই তো হল! এখন কেওড়াতলা গিয়ে প্রয়োগ করব।

এখন, এই হঠাৎ জলঝড়ে টুকরোগুলো কাজ দিল। প্রিয়নাথ এবার ফাটলের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবা মার বিছনাটা রক্ষা

না করলে বুড়ো-বুড়িকে সারা রাত জেগে কাটাতে হবে। প্রিয়কে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে মা বলে—ও আর দেখিস কি? শো গিয়ে তোরা। যা হবার হবে।

আদিনাথ বলেন—একটা গামছা ফেলে দে মশারির 'পর। বর্ষা-কালের বৃষ্টি তো নয়, খানিক পরই থেমে যাবে।

প্রিয়নাথ বলে—কাজ করুন, আপনি আর মা আমাদের বিছানায় যান। খোকা ঘুমাচ্ছে, ও থাক আপনাদের সঙ্গে।

—তোরা ভিজে বিছানায় শুবি? বৌমা কি পারবে?

—আপনারা যান তো, সে আমি দেখছি।

এবার কল্যাণী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। তার খুব খারাপ লাগছিল। ওর বিছানায় জলের ভয় নেই, চুপচাপ শুয়ে থাকাটা স্বার্থান্ধতার সামিল। আর যাই হোক, বৌদি কিছু মনে করতে পারে। প্রিয়নাথের পর একটু মমতা হয়, ও বিছনায় দু' জন শুলে দাদার ঘুম হবে না। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সাংসারিক এই উৎপাতে ওকে কষ্ট না দেওয়াই ভাল।

—একটা কাজ কর দাদা, বৌদি আমার বিছানায় আসুক। দু জনে একটু চেপেচুপে চলে যাবে, একটা রাত্তিরের তো মামলা। তুই জলের জায়গাটা গুটিয়ে বাবার বিছানায় ঘুমিয়ে পর। রাত কম হল না।

মঞ্জু এতক্ষণ দরজার আড়ালে ছিল। এ ঘরে পা দিয়ে তার হঠাৎ মন্তব্যে সমস্ত সুর কেটে যায়। এই প্রাকৃতিক বেনিয়মে জীর্ণ বাস-স্থানকে ঘিরে সংকট-সুরাহার যে পারস্পরিক মধুর প্রচেষ্টা চলছিল, মঞ্জু যেন তা ভেঙ্গে দিল।

—আমায় নিয়ে ভাবতে হবে না কারও। আপনারা ও ঘরে যান। তুমি শুয়ে পড়ো কল্যাণী।

ওরা নিশ্চুপ—আদিনাথ নীরজাদেবী এবং কল্যাণী। প্রিয়নাথের উপস্থিতিতে তাদের কিছু বলা এখন শোভা পায় না। প্রিয়নাথেরও মঞ্জুর এই বাঁকা ভঙ্গিটি পছন্দ হয়নি। তবুও স্বাভাবিক হবার চেষ্টায়

বলে—তা কেন, যাওনা তুমি কল্যাণীর বিছানায়। ঘুমুতে না পারলে শরীর খারাপ হবে। আমি বাবার বিছানায় ঠিক ম্যানেজ করে নেব।

—থাক্! আমারটা আমাকেই ভাবতে দাও।

কাটা কাটা মর্মস্পর্শী কথা। নীরজাদেবী আর সহ্য করতে পারলেন না। বুদ্ধিমতী, রুচিশীলা মহিলা। এখন না হয় সাংসারিক অনটনে হাত পা বাঁধা। কিন্তু সব বোঝে সে। প্রিয়র মুখের দিকে তাকিয়ে উচিত কথাটিও সে বলে না। প্রিয়নাথ তার সন্তান হলেও, মঞ্জু তো তার স্ত্রী। দুঃখ পাবে ছেলেটা। আর তা ছাড়াও……! মাঝে মাঝে মঞ্জুর উপর সহানুভূতি হয় নীরজাসুন্দরীর। জীবনের এক বিশেষ আশা-আকাঙ্ক্ষার বিকাশে সেও এ সংসারে বৌ হিসেবে কাটিয়েছিল। দেশ কালটা এমন খণ্ড খণ্ড হয়নি সেদিন, শখ আহ্লাদের কিছু ভাগ আদিনাথ নীরজাদেবীর ভাগ্যে জুটেছিল। কিন্তু মঞ্জু? এই হারহাভাতে সময়ে ভাঙ্গাপুরীতে বউ হয়ে ঢুকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখল কৈ? এমন কি তাদের বধূ-জীবনের মাটিফলবাতাসের অনাবিল স্পর্শটুকুও নয়। কিছু বলেনা নীরজা তাই। বৌমার ব্যবহারে অন্তরে আঘাত পেলে রাতে বিছানায় স্বামীর কাছে দুঃখ করে।

আজ, কেন জানি নীরজাদেবী আঘাতটুকু সহ্য করতে পারল না। বৌমার কথা কটিতে নিজেকে ভয়ানক হীনমন্য লাগে। মনে হল বৌমার চাপা উষ্মার উপলক্ষ্য প্রিয় নয়, এ ঘরেরই তিনটি মানুষ।

—আমরা কিছু বলিনি বউমা! প্রিয় ও ঘরে যেতে বলল তাই।

—আপনাদের বলছি না মা।

—না, তা বলবে কেন। দু' কৌটা জলে শোয়ার অভ্যেস আমার, তোমার শ্বশুর মশাইয়ের আছে।

—অভ্যেস কার নেই মা?

প্রিয়নাথ এ ঘরে চলে এল। আদিনাথ নীরজাদেবীকে ধমক দিয়ে বলে—আঃ তুমি চুপ করবে? তোমরা সহজ জিনিষকে বড্ড জটিল করে তোল।

মঞ্জু চুপ। এ ঘরে এসে প্রিয়কে বলল—বালিশ দিয়ে আসব? প্রিয়নাথের পাইপে নিঃশব্দে চারমিনারের চিন্তিত ধোঁয়া উঠছে তখন।

—বুঝিনা, বাড়িওয়ালাকে ফাটা ছাদ সারাতে বললে কি ক্ষতি? যেন, চুরি করে আছি!

—তুমি বুঝবে না। প্রিয়নাথ মন্তব্যটুকু সেরে চুপ করে রইল।

চুরি ঠিক নয়, প্রিয়নাথ বোঝে কোথায় আশঙ্কার বীজ লুকিয়ে আছে। এ সব জটিল বিষয়। বুঝিয়ে বলা যায় না সবাইকে। কেন সে মাসে মাসে তিরিশটি টাকা রেন্টকন্ট্রোলে পাঠিয়ে সহ্য করছে সমস্ত কষ্ট এবং অব্যবস্থা। এমনকি বাবাও বোঝেন না, হয়তো আঁচ করতে পারেন। দিন কাল নিয়ে মাঝে মাঝে হা হুতাশ করেন। মাঝে মাঝেই মঞ্জু বলে—তুমি বলোতো গিয়ে একদিন। কলকাতা শহরে আইন-কানুন নেই? প্রিয়নাথ উত্তর দেয়—আইন মানেই তো পয়সা। তা ছাড়া অনেক ব্যাপার আছে।

প্রায় তিরিশ বছর আগে যখন আদিনাথ এ বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল, অভিজাত ব্যক্তিরা এলাকার নামে নাক সিটকোতো। মানুষ থাকে। ওটা আবার কলকাতা কবে হল?

রেললাইন, জলাভূমি, খাটাল—সন্ধ্যের পর অপরিচিত মানুষ পাড়ায় ঢুকতে সাহসই পেত না। সেই যুগে তাই সম্পূর্ণ বাসাখানা পেয়েছিল সস্তায়। সামনে খোলা মাঠ, রোদ জল, মাসে তিরিশ টাকা। পঞ্চাশের ছিন্নমূলেরা সেদিন আর কি ভাল আশ্রয় প্রত্যাশা করতে পারত? সেই থেকে প্রায় তিন তিনটি দশক—কলকাতার বুকে দাঙ্গাহাঙ্গামা, ঝড় জল, রাজনৈতিক ডামাডোলের দিনগুলো কাটিয়ে নগর-জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে অভ্যেসকে বেঁধে যখন স্থবির হয়ে উঠেছে, হঠাৎ এলাকার রাস্তাঘাট, ব্রীজ, খোঁড়া-ভাঙ্গার মধ্যে যখন অভিজাতদের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠল, আদিনাথরা নিজেদের পরবাসী মনে করে।

প্রাতে আদিনাথ লেকে ভ্রমণ করতে যেত, কোন কোন দিন সন্ধ্যায় গোলপার্কে। খোকা থাকে মাঝে মাঝে। ইদানিং সে

যেতে চায় না দাছুর কাছে। স্বামীজির প্রস্তরমূর্তির দিকে অনিমেষ তাকিয়ে আদিনাথ অদ্ভুত বল পেত দেহ মনে। কিন্তু মন খুলে কথা বলার, দুটো বিষয় নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার লোক পায় না। সবাই যেন আদিনাথকে এড়িয়ে চলে। ডাবল ডেকার, স্পেশাল, মিনি এবং দোকানে নরনারীর প্রসাধনের চাকচিক্যে মাঝে মাঝে আদিনাথের ভুল হয় এই কলকাতায় কি পঞ্চাশের দশকে আপন ঠিকানা, জন্মভূমির স্নেহভালবাসামণ্ডিত ভাবমূর্তি তৈরী করেছিল?

মিনি ক্রনি সলিড স্টেট—ওয়েষ্টন টি. ভি.। ক্রিষ্টাল ইলেকট্রনিক গ্যাস লাইট। বম্বে ডাইং। ফিয়েস্তা। গ্যাশনালাইজড ব্যাঙ্ক। সাফরি লাগেজ। ট্রাভেলিং এজেন্ট। হোটেল ফাইভ স্টার। কিউ ফব স্পেশাল এণ্ড মিনি বাস। জ্যাম। কম্পিউটারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। কুম্বিং অপারেশন। মর্গ। লিবারেটেড জোন। অফি-সিয়ালস ঘেরাওড। ডেড টেলিফোন। মেট্রো রেল। বাইপাস! মালটি ন্যাশনাল।

৩

পরদিন ঘুম ভাঙ্গতে বেলা হয়ে গেল আদিনাথের। গত রাতের উৎপাত, আগোছালো ঘুম এবং বার্ধক্যের এই বেনিয়মে রক্ত-চাপ-জনিত ব্যাপারে দেহটা এত ক্লান্ত কিছুতেই সময় করে উঠতে পারে নি। খুব ভোরে ওঠা তার অভ্যেস। সাড়ে চার কি পাঁচটার মধ্যেই উঠে হাত-মুখ ধুয়ে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় নির্মল বায়ু সেবনে যায়। আগে লেকে যেত, অনেক বৃদ্ধ আসে সেখানে। মর্মর টাক, ছড়ি, লাঠি, মোজা কম্ফোরটারে মনে হয় অতীত মূর্ত হয়ে কোন অবসিত যুগের সমস্ত অভিমান ও আত্মপরিমা নিয়ে ঘুরছে, ক্ষীণ আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখছে এই নির্মল বাতাসে হয়ত আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে। আদিনাথ বেড়াতে যেতে পারেনি আজ। শারীরিক উৎপাত তো ছিলই, উপরন্তু এ্যালার্ম-দেয়া ঘড়িটা তুলে আনতে ভুলে গেছল। ঘর-বদলের সময় বালিশচাদর সঙ্গে নিলেও মাথার কাছে কুলুঙ্গির ঘড়িটা খেয়াল ছিল না। ওটাই এখন আদিনাথের ঘণ্টা প্রহরের সাথী। ঠিক সাড়ে চারটেয় বেজে ওঠার সঙ্গেই মঞ্জু কাঁচা ঘুমের বিরক্তিতে ঘটাং করে বন্ধ করে দিয়েছিল, এ ঘরে বুড়ো আর কোন স্কোপই পায় নি।

সকালটি আজ বেশ মনোরম। উজ্জ্বল গাঢ় নীল আকাশ। আদিনাথ বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ঘাস পেয়ারা গাছ আর সামনের টালির চালাটা চকচক করছে। এ্যান্টেনার জটগুলো পরিষ্কার রূপোলী। পাশের দোতলা বাড়িটা থেকে রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভেসে আসছে। দূরে রেললাইনের ইলেকট্রিক হর্ন এবং চাকার শব্দ। আদিনাথ কল্যাণীকে ডেকে বলেন—প্রফুল্লর বাড়ি খবর দিতে হবে। সকালে যাওয়া হল না।

কল্যাণী কাগজ পড়ছিল। মুখ তুলে বলে—ভবানীপুর! খবর

দেয়া কি দরকার? না গেলেই তো বুঝতে পারবে!

—হাঁ করে বসে থাকবে তো! একটা খবর দেয়া উচিত। দায়িত্ব বলে কথা।

—বাব্বাঃ! কখন যাই, কখন আসি? খোকার স্কুলে যেতে হবে আজ।

—খোকার স্কুলে কেন? আমার গেলে হয় না?

—বৌদি বলল। ওদের স্কুলে টিফিন চালু করেছে, একস্ট্রা পঞ্চাশ টাকার ধাক্কা! ঘরের টিফিনে চলবে কিনা, বৌদি জানতে বলল।

—ও আমি পারব।

—তুমি গেলেই ঝগড়া করবে। কল্যাণী হেসে ফেলে। বাবার মুখের উপর কথাটা বলা ঠিক হল না বোধহয়। আদিনাথ স্থির দৃষ্টিতে কল্যাণীর মুখের দিকে তাকান। ভাঙ্গা বোতল-কাচের আড়ালে তার সদ্য ছানিকাটা চোখটা স্ফীত হয়ে পিট পিট করল। হঠাৎ হেসে বলেন—যাক্! তা যাবি একবার খবর দিয়ে আয়, সকালে এখনও আপিসের ভীড় লাগেনি, এক্ষুণি বেরিয়ে পড়।

—বলছ বটে, ভীড় কি কমতি কিছু?

—টুক্ করে পৌঁছলেই হল, ফেরার সময় বালিগঞ্জমুখো ট্রামে ভীড় হবে না এখন। আঃ, দায়িত্ব,বলে তো কিছু আছে। আমাদের কি যেমন খুশি চললে হয়?

—তোমায় বলেছে! আজ কাল কে কার দায়িত্ব খুঁটিয়ে পালন করছে, তুমি রাখো তো!

আদিনাথ আহত হলেন। বুড়োবয়সে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলে, মনের মত না হলেই ভয়ানক রাগ হয়। বাইরের বিশৃঙ্খলায় দুঃখ পান, মূল্যহীনতায় হা হুতাশ করেন কিন্তু বাড়ির মানুষদের ব্যবহারে রেগে যান। মনে হয় আদিনাথের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হচ্ছে।

—তোদের জেনারেশন ও কথা বলবেই। আমরা ও ভাবে মানুষ হইনি, প্রফুল্ল জানে।

কল্যাণী নরম গলায় বলল—রাখো, তোমার কেবল প্রফুল্ল আর প্রফুল্ল! কেমন গুছিয়ে নিয়েছে দেখছ? আর আমরা?

আদিনাথের ঝুলে পড়া গালের মাংস থির থির করে কাঁপতে থাকে। মুখটা ঈষৎ তুলে কল্যাণীকে জরিপ করে বললেন—আমরা কি? কি হয়নি আমাদের? প্রফুল্লর যাই হোক, মনে মনে শ্রদ্ধা করে আমাকে। তার বাড়িতে পড়াই বলে কি সাহায্য নিচ্ছি? আদিনাথ কারও দান গ্রহণ করে না। মাথা উঁচিয়ে চলি। প্রফুল্ল ভাল করেই জানে, আর জানে বলেই পুরোনো আদবকায়দায় আমার সঙ্গে কথা বলে।

কল্যাণী আর প্রসঙ্গটা বাড়াতে চাইল না। বাবা যাই বলুক কল্যাণী জানে বাবার টুইসানির টাকা সংসারে কত অপরিহার্য। মাথা উঁচিয়ে বাবা চলে ঠিকই, কিন্তু মানুষ মানুষের মর্যাদা এ শহরে দেয় বলে কল্যাণীর মনে হয় না।

হেসে বলে—উঃ বাব্বা! বয়স বাড়ছে আর কেবলই সেন্টিমেন্টাল হচ্ছ! যাব বলছি, ভবানীপুর গিয়ে খবর দিয়ে আসব।

আদিনাথ ঠিক ধরতে পারেনি। এই নির্মল, বিধৌত আকাশে, শহরের হঠাৎ রূপ পাল্টানোর মধ্যে, ভবানীপুর যাওয়ার প্রস্তাবে কল্যাণীর হৃদয়টা নেচে উঠেছিল। বড় গভীর আর মধুর এই কম্পন, দ্রুত রক্ত চলাচল। পাছে উৎসাহের আতিশয্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, বাবার কাছে সে অনিচ্ছার অভিনয় করছিল। অভিনয়টুকু করতে ভালো লাগছিল। আস্তে আয়নার সামনে চিরুনির হালকা স্পর্শ দিতেই লক্ষ্য করল মঞ্জুর কৌতূহলী প্রতিবিম্ব। ঘাড় ফেরাতেই, মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল—চললে? কল্যাণীর দাঁতে ক্লিপটা ধরা ছিল, কোন উত্তর দিল না।

স্টোভটা ফুটো হয়ে যাওয়ায় সকালেই আঁচ পড়ে উনোনে। তাই মিছি মিছি কয়লাগুলো পুড়ে যাবার ভয়ে এ বাড়িতে বাজার আসে সকালে, রান্নাও হয়ে যায়। যদিও অফিস নেই তবু খোকার স্কুল তো আছে। আগে দেরিতে বাজারে যেতেন আদিনাথ।

অফিসবাবুদের দোর্দণ্ড প্রতাপে দর জিজ্ঞেসেরও কোন সুযোগ মেলে না। একটু বেলা না হলে আদিনাথদের বাজারে ঢোকার উপায় নেই। ইদানিং প্রিয়নাথ হিসেব করে দেখেছে জ্বালানীর যা দাম, তিন চার ঘণ্টা উনুন জ্বললে গড়ে একই খরচা; সামান্য সস্তার শাক-সব্জিতে কোন সুরাহা হয় না। তাই বাবাকে বলেছিল—ছেড়ে দিন, যা পান নিয়ে আসবেন।

আজ প্রিয়নাথই বাজার সেরেছে। বাবার ঘুমের ব্যাঘাত সে অনুমান করতে পেরেছিল।

মঞ্জু ফ্যানটুকু পাশের আধলাজমা সরু ফাঁকা যায়গাটাতে ফেলে দিল সপাৎ করে, আর তখনই শেওলাধরা ভাঙ্গা পাঁচিলের ওপাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে টালির চালার বউটি ঘোমটা টেনে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলল। মঞ্জু মাথা নাড়ল। লোডশেডিং; নিজের বিছানায় বসে হাতপাখাখানা নাড়তে নাড়তে আদিনাথ দুজনের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করেন। একটু পরেই মঞ্জু হাসতে হাসতে বলে—বাবা, রেশনে রেপসিড্ দিচ্ছে। আমাদেরটা তুললে হত না?

—দিচ্ছে? আদিনাথ ব্যস্ততায় বারান্দায় আসেন। কে বললো?

—ঐ তো গিরিনবাবুব স্ত্রী।

—বেশ, বেশ! পড়াতে যখন যাওয়াই হলো না, তুলে আনি।

—দাদু, আমি যাব। খোকা বলে।

—যাবি? চল। একা টেনে আনতে হাঁপ লাগে।

—যা খোকা। দাদু কি একা পারে? মঞ্জুর গলায় মমতা। এখন বোঝাই যাবে না গত রাতে এ বাসায় পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরেছিল। আদিনাথেরও দুঃখ লাগে মঞ্জুকে দেখে। এই অন্ধ এক তলাটায় মেয়েটা কেমন দগ্ধ হয়ে গেছে। ওরা যখন পরস্পর বারান্দায়, হঠাৎ সামনের দোতলার বৈঠকখানার জানলাগুলো ধপাস ধপাস বন্ধ হয়ে গেল। মোটা গিন্নির কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল—ধাপা, ট্যাংরায় গিয়ে থাকতে পারে! কলকাতার শখ কেনরে বাপু! ফ্যান, জল, নোংরা ফেলবে বাড়িটার সামনে! অসভ্য! গন্ধে টেঁকা যায় না।

এ বারান্দার লোকেরা তাকিয়ে থমকে যায়। মঞ্জুর চোখেমুখে অসহায়তা। আদিনাথ ভেবেছিলেন ঐ টালির চালার উদ্দেশ্যে এ সব মধুর বচন। প্রায়ই এমন জোটে ওদের ভাগ্যে। কত কর্পোরেশনে নালিশের হুমকি, অপমান হামেশাই চলছে। কিন্তু আজ কর্কশ ভারি গলার সঙ্গে আরও দু একটি স্বর যুক্ত হয়ে গেল।

—মৌরসি পাট্টা পেয়েছে! ফ্যানের পচা গন্ধ বোঝেনা নিজেরা? পারেও বাপু!

একটি বাচ্চা ছেলে হঠাৎ জানালা ফাঁক করে খোকার উদ্দেশ্যে বলে—টি.ভি দেখতে আসে, লজ্জা করে না! মোটা গিন্নি বলে—ছোঁড়াটার কি দোষ, ধাড়িগুলো কি করে!

ওরা ঘরে চলে এল; আদিনাথ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেন—ফ্যান ফেলেছিলে বৌমা?

—হ্যাঁ।

আদিনাথ চুপ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বলেন—উঠতি পয়সার কি গরম! এলি তো সেদিন। আমরা ধাপা, ট্যাংরা যাব? বেশ!

—ছেড়ে দিন। চাল ভাল পেলে তুলবেন। বাঁধানো খাতা পেলে নেবেন, খোকার দরকার।

ওরা বেরিয়ে যায়।

প্রিয়নাথ বাসায় ছিল। ও বাড়ির গিন্নীর মধুর বচন সে অনুমান করতে পেরেছিল। ডঃ বোসের মা। হাজরার দিকে নার্সিং হোম আছে। গর্ভপাতের পয়সায় বছরখানেক হল জমিটা কিনে বাড়ী তুলেছে। প্রিয়নাথকে চেনে সে। বিশেষ করে সরকার বদল হবার পর ডঃ বোস যেন সেধেই পরিচয়টা রাখতে চায়। গলির মোড়ে ক্বচিৎ কখনো দেখা হলে মুচকি হাসে। ওর ছেলে খোকার সহপাঠী। মাঝে মাঝে খোকা উত্তেজক খেলার দিন টি. ভি দেখতে যায়। বহু নিষেধ সত্ত্বেও খোকাকে বোঝান যায় নি। —শালারা কি কর্পোরেশন দেখাচ্ছে?

মঞ্জু বলে—শুনিয়েতো দিল। মুরোদ থাকলে জবাব দিতে।

—ছেড়ে দাও! অত ভাবলে চলে না। শচীনদা তো এলাকার পুরোনো কমিশনার, বললেই হুজ্জত করতে পারি। দিনরাত ওদের বিলিতি কুকুরটাও ঘেউ ঘেউ করছে, উনিও করছেন। বুদ্ধি আছে?

—আমরা না হয় ছাড়লাম, কিন্তু খোকার? তার ভবিষ্যৎ?

প্রিয়নাথের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এই মুহূর্তে জবাব দিতে পারে না।

র‍্যাশন নিয়ে খোকা আর আদিনাথ ফিরে এসেছে। তেল, চিনি, ভালো চাল মিলেছে। খাতা পায়নি, ফুরিয়ে গেছে। বাসার সবাই খুশি। র‍্যাশন এখন লটারির মত, ক্বচিৎ কোন সপ্তাহে ভাল চাল পেয়ে গেলে মনটা খুশি হয়, বিশেষ করে বাড়ির গৃহিনীদের। নীরজাদেবী বলে—ছাই, দেশের বাড়িতে এ চাল কেউ মুখেও তুলত না। আদিনাথ বলেন—ভুলে যাও। সে তো বিদায় দিয়ে এসছ কবে। খোকা ফেরৎ একটা কাঁচা টাকা আঙ্গুলে বাজাতে বাজাতে ভালো করে বছর দেখে নিল। অস্বাভাবিক চক চক করছে মুদ্রাটি। যেন সদ্য টাঁকশালের ছাপ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। টাকায় সাল খোঁজা খোকার শখ।
—দাদু, একাশি সালের পয়সা।

আদিনাথ চোখের কাছে এনে পরীক্ষা করে। অস্বাভাবিক চকচক করছে, তবুও মনে হল পুরোনো আমলের রূপোর টাকার সঙ্গে তুলনাই হয় না। কি ভারি আর মজবুত! এগুলো তো দু দিন বাক্সে থাকলেই কালচে মেরে যায়। হঠাৎ কি মনে হতেই খোকাকে জিজ্ঞেস করেন—বল্‌তো কোলকাতায় প্রথম টাকা কবে তৈরী হয়?

খোকা খানিক তাকিয়ে বলে—কি জানি?

—তুই কি বলবি? এখানে যারা টাকার গরম দেখায়, তারাও কি জানে? ইতিহাস-টিতিহাস লোকে আর মনে রাখতে চায় না।

—কবে দাদু? কবে টাকা হয়েছে?

—ঐ সেই পলাশীর যুদ্ধের পর। কলকাতায় টাঁকশাল তৈরীর পরওয়ানা দেন নবাব মীরজাফর ১৭৬০ সালে। ১৭৬২ সালে জন প্রিন্সেপ বলে এক সাহেব প্রথম কলকাতায় টাকা খোদাই করেন।

তার একদিকে মোগল বাদশাদের মাথা, অন্যদিকে ফার্সী লিপি। ছাপা হত ফলতায়।

—পাওয়া যায় সে টাকা? খোকা'র বিস্ময় লাগে।

—জানিনা, তা কি আর জমিয়ে রেখেছে কেউ?

নীরজাদেবী খোকাকে টেনে এনে বলে স্কুল যাবি তো? চান-টান করতে হবে না? মঞ্জু এককাপ চা তুলে দিয়ে গেল. আদিনাথের মনে হল ঠিক সময় ঠিক জিনিষটি কি মধুব! নাক কুঁচকে, সাবধানী ঠোঁটজোড়া কাপের মুখে চুমুকের জন্য এগিয়ে যায়।

কাত্বর ছায়াটা তখন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। মোটা গলায় 'মাস্টারসাব' ডাক দিতেই আদিনাথ অনুমান করতে পারে। পাখাটা রেখে, চায়ের কাপ হাতে দরজা খুলেই দূরবিনের মত মুখ করে বলেন —ওঃ! কাত্বু? কি খবর? অনেকদিন খোঁজ পাইনি তোমার?

—খবর ছিল না হাতে। মার্কেট খুব খারাপ।

—তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস। আদিনাথ ঘর থেকে মোড়া বার করে আনেন। রান্নাঘরে বৌমার উদ্দেশ্যে এক কাপ চায়ের হাঁক দিয়েই জাঁকিয়ে কাত্বর সামনে বসলেন।

কাত্বু মুসলমান। অনেকের চোখে কাত্বু কলকাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য বিহারী মুসলমানদের একজন। শহরের মানুষ সাধারণত মুসলমান বলতে বোঝে বাঙ্গালী অথবা বিহারী। কিন্তু কাত্বর কাছে আদিনাথ উৎসাহ ভরে জেনে নিয়েছিলেন ওরা নাকি কলকাতার প্রাচীন মুসলমানদের অন্যতম ধারা—টিপু সুলতানের বংশধর। থাকে টালিগঞ্জ। দক্ষিণ কলকাতায় টালিগঞ্জের বিশাল অঞ্চল জুড়ে মুসলমানদের বসতি গড়ে উঠেছে, টিপু সুলতানের বংশধর প্রিন্স গোলাম মহম্মদ, আনোয়ার শাহ ও আত্মীয় স্বজনদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পোষকতায়। ধর্মতলার মসজিদ নাকি ওদের বংশের অবদান।

তিনপুরুষ ধরে কাত্বরা পুরোনো বইয়ের ব্যবসা চালাচ্ছে। নবাবী আমল নেই, খানাপিনার বিলাসিতাও উঠে গেছে। কাত্বর চাচা স্যাকরা গাড়ির কোচোয়ান ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিংএর

ধারে তিনপুরুষের ব্যবসাটি এখন কান্থর অধিকারে। কান্থর বাপকে আদিনাথ দেখেননি, শুনেছেন ছেচল্লিশের দাঙ্গায় মির্জাপুর ষ্ট্রিটে খুন হয় সে। দাঙ্গার দিনে প্রাণ হাতে নিয়ে পুরোনো বইয়ের সন্ধানে এক হিন্দুবাড়ির অন্দর মহল থেকে ফিরছিল। কান্থ তখন অনেক ছোট। সেই থেকে কান্থ নানান প্রতিকূল ঝড়-ঝাপটায় ব্যবসাটিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এখন সে পাকা কারবারী। বিস্থে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত, কিন্তু যে কোন গবেষকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কথা বলতে পারে —অন্তত বইয়ের ব্যাপারে। ও বোঝে কোন বই কাদের কাছে সমাদর পাবে। হাঁড়ির খবর নেবার মত, ও আঙ্গুল গুনে বলতে পারে এই বিশাল কলকাতায় ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহের কথা। শুধু কলকাতা কেন, উত্তরপাড়া, বড়িশা, শ্রীরামপুরেরও কিছু কিছু খবর রাখে কান্থ।

কান্থর স্বভাবটি নম্র, স্বল্পভাষী। পুরনো চটি, জামা প্যাণ্ট যেন সর্বদাই ঘামে ভেজা, কপালে এক ঝাড় চুল উপচে আছে। মুখের চামড়া অবশ্য কর্কশ।

পঞ্চাশে এখানে আসবার কিছু পর থেকেই আদিনাথের সঙ্গে কান্থর পরিচয়। বলতে গেলে প্রথম জীবনের খদ্দের। সেই থেকে সম্পর্কটা নিবিড়তর হয়েছে। সকালে ছুটো ট্যুইশনিতে সংসারের সাহায্য করে বাকি সময়টা দর্শন, সাহিত্য ও মানবজাতির ইতিহাস সংক্রান্ত বই নিয়েই বুড়ো দিন কাটান। কিছু দিন আগে ডান চোখের ছানি কাটানো হয়েছে তবুও পুরু চশমায় বইয়ের আড়াল থেকে মাথা তোলেন না। মাঝে মাঝে খোকাকে টুক টাক প্রশ্ন করে অবাক করে দেন। ভাঙ্গা বাসা, স্থান অকুলান, তবুও কান্থর সঙ্গে দেখা হলেই চঞ্চল হয়ে ওঠেন। বইগুলো বৃদ্ধের প্রাণ।

—একটা ভালো লট পেয়েছি মাস্টারসাব। খুব সস্তায় বিক্রী হচ্ছে।

—কোথায়? পার্সোনাল কালেক্‌সন?

—হাঁ। জোড়াসাঁকোয়।

—কি নাম ভদ্দরলোকের ? কত টাকায় পাচ্ছ ?

—খুব কম দামে, কিন্তু দালাল লেগে গেছে। কিছু টাকা এ্যাড-ভান্স করলে ভালো হয়, আজ কালের মধ্যে।

—নামটা কি শুনি ?

—আপনি চিনবেন না। আশুতোষ সিংহ, ঠিকানা লেখা আছে।

—জোড়াসাঁকোর সিঙ্গি পরিবার ? চিনব না কেন ? শান্তিরাম সিংহের বংশ। পাটনার চিপ্ মিডি্লটন সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ দুই ছেলে, কালীপ্রসন্ন সিংহতো ওই বংশেরই ছেলে, ঐ যে মহাভারত বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। তা ভালো বই আছে ?

—আপনাকে দু' খানা দেব। কিন্তু কিছু টাকা হলে ভালো হত।

টাকার কথা শুনে আদিনাথের মুখে করুণ হাসি ফুটে উঠল। বাসায় যা ছিল কুড়িয়েবাড়িয়ে র‍্যাশন তুলে এনেছেন। কিন্তু বই-গুলো যদি হাতছাড়া হয়ে যায় ? কোন উপায় খোলা নেই আদিনাথের চোখের সামনে। ভাবলেন বৌমাকে একবার জিজ্ঞেস করবেন কিনা। লাভ হবে কি ? মঞ্জুর জন্য গোটা দশপনের সুরবেকস্ টি আনতে প্রিয়নাথ টালবাহানা করছে, তারপর গতকাল এসেছে খোকার পোষাক। সুতরাং খোঁজখবর নিয়ে কোন লাভ হবে না।

—ভাই, টাকা এখন কি করে দেই ? বড্ড টানাটানি। দেখ না অন্য কোথাও ? কিন্তু চান্স্ টা যেন হাত ছাড়া না হয়।

—আমিও ভাবছি মাস্টারসাব ! সকালে একবার খোঁজ নিয়ে গেলাম, দেখি।

আদিনাথ অপরাধীর মত বলেন—আমার জন্য খানদুয়েক থাকবে না ?

কানু হেসে ফেলে। মাস্টারসাব তার পয়া খদ্দের। সেই প্রথম যুগ থেকে উনি আছেন। আজ এ্যাডভান্স দিতে পারলেন না বলে কি জুটবেনা ওনার জন্য !

—তালে আমি খবর দিলাম কেন ? ফিলসফি আর হিষ্ট্রির বই

দুটো আপনাকে দেব। টাকা আপনি এখন দিতে পারছেন না, পরে দেবেন, আমি শুধু এ্যাডভান্স নিতে আসিনি, খবরটা জানিয়ে গেলাম। আপনার সঙ্গে কি এভাবে কারবার করি?

—না, না, ছিঃ! আমি তা বলছি না তোমারও তো দরকার। দালাল লেগেছে বললে না, সেই তো মুসকিলের কথা!

—দেখি! আপনি ভাববেন না।

কানু উঠে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আদিনাথ ঘরে ঢোকেন। শুনতে পান খোকা রান্নাঘরে মা'কে ধমকাচ্ছে।

—টিফিন দাও তুমি, ছুঁড়ে ফেলে দেব।

—ছুঁড়ে ফেলবি? এত সাহস?

—দেখবে? আমার লজ্জা করে না বুঝি? ক্লাসের ছেলেরা খ্যাপায়!

—খ্যাপায় তো কি করব? মাসে পঞ্চাশ টাকা দেয়ার ক্ষমতা নেই আমার। ও সব তোমার বন্ধুদের পোষায়।

—পোষাবেই তো, ওরা টি, ভি কিনতে পারে, বেড়াতে যেতে পারে আর তুমি টিফিনের পয়সা দিতে পার না? পড়াও কেন তবে?

আদিনাথের মাথায় আগুন ধরে যায়। কোন এক মহাসুড়ঙ্গ থেকে যেন তার পরিবারে বেনো জল ঢুকতে চলেছে। অসহায় চিৎকার করে উঠলেন—রান্নাঘরে চলছেটা কি? আদিনাথ দেখতে পেলেন না খোকা দাদুর ধমকের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করছে।

ভবানীপুরের বাড়িতে কলিং-বেল টিপতে ঝি এসে দরজা খুলে দিয়েছিল। কলকাতায় এসব বাড়িতে প্রাতঃকালেই কলিং-বেল বাজলে গৃহস্থরা বিরক্ত বোধ করে কিন্তু এ বাড়িতে এ সময়ে বেল বেজে ওঠা অভ্যেস হয়ে গেছে। প্রতিদিন মাস্টারমশাই আসেন। আজ কল্যাণীকে দেখে বাড়ির ঝিও কিছুটা অবাক হল। মনের কোণে সন্দেহের ছায়া উঁকি মারল। কারণ ছোটবাবু আজ অফিস যাবে না। ঝিয়েরাই হলো অন্দরমহলের গোয়েন্দা। মাঝেসাঝেই

এ বাড়িতে কল্যাণীর যাতায়াত এবং বাড়ির অন্যান্যদের এ সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়ায় সে মনে মনে একটা কিছু আঁচ করে রেখেছে।

কল্যাণী কিছু বলার আগেই, ঠোঁটের কোণে হাসির ঢেউ তুলে বলে—হ্যাঁ, ছোটবাবু বাড়ি আছে। এই হাসির ইঙ্গিতটা কল্যাণীর ভালো লাগল না। কোথায় যেন সম্মানের সূক্ষ্ম তারে ঘা পড়ল। শত হলেও সে এ বাড়ির ঝি, তার এ সাহস কোত্থেকে আসে? কোন জবাব দিল না সে, ঘাড় বাঁকিয়ে বিরক্তির ভ্রূভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল সব: সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল, পেছন ফিরে তাকালো না একবারও।

তিনতলার দরজার মুখেই লিলিবৌদির সঙ্গে দেখা। লম্বা বিলিতি কুকুরটা নখ খামচে দৃঢ়ভঙ্গিতে কাছে এগিয়েই কল্যাণীর পরিচিত গন্ধ মুখচোখের পেশী শিথিল করে লম্বা জিবটি বার করে আনুগত্য প্রকাশ করল। কুকুর কল্যাণী পছন্দ করে না। কেমন অস্বস্তিকর বিরক্তি লাগে তার। তবুও রাস্তার কুকুরগুলো নিজ নিজ জীবনের দায়িত্বে ক্ষুৎপিপাসার সংগ্রামে যাযাবরী; কোন মাথাব্যথা নেই ওদের জন্য, সহসা গায়ে এসে পড়ে না। কিন্তু বাড়ির এই আহ্লাদে জামাইগুলো অসহ্য। পরিবারের একজনের মতো এদের শারীরিক কুশলতা, আদরবায়নায় সহাস্য সহানুভূতি না দেখালে গেরস্থরা ক্ষুণ্ণ হন। কল্যাণীর এক কলেজের বন্ধু সুদেষ্ণার বাড়িতে কুকুরের কথা জিজ্ঞেস না করলে বলতো—আমাদের ফিজিকে আদর করলি না? তুই কেমন রে? কি কষ্ট ওর, স্প্যারিন খাওয়াচ্ছে মামণি, জানিস?

—স্প্যারিন কি?

—তুই একটা হাঁদা, কিছু জানিস না।

—কি করে জানব, আমাদের ওসব বালাই নেই।

সুদেষ্ণা ঠোঁট উল্টে বলতো—তাই বল। ভালোই করেছিস,খরচা তোদের পোষাত না। সত্যিই সুদেষ্ণা কল্যাণীকে আঘাতের জন্য কথাগুলো বলে নি, এটাই এদের স্বাভাবিক কথাবার্তা, তবুও কল্যাণীর মর্মে বিঁধেছিল।

লিলি বিস্ময়ে মুখ তুলে বলে—তুমি? কি ব্যাপার? লিলির স্লিভলেস্ ব্লাউজ, হাল্কা ম্যাচিং শাড়ি, চোখে মুখে চুলে সুনিপুণ অবিন্যস্ততা। দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না ওর গর্ভের সন্তান দু-বছর বাদে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। এইটুকুর জন্য কি অর্থব্যয় আর নিয়মনিষ্ঠা! মঞ্জুর সঙ্গে এ নিয়ে বাসায় কল্যাণী হাসাহাসি করে—জান বৌদি, কচিখুকি সেজে থাকে! বয়স তো তোমার চাইতে কম নয়।

—বাবা আসতে পারবে না আজ, হঠাৎ প্রেসারটা বেড়েছে।

—বোসো! শুধু এ জন্যই ছুটে এলে?

'শুধু এ জন্যই' কথাটা কল্যাণীর কাছে অপমানের মত ঠেকল। মর্মার্থ বুঝতে কল্যাণীর অসুবিধে হয় না। জিবের ডগায় জবাবটা এসে গিয়েছিল, অনেক কষ্টে দমন করে রাখে। সোফায় বসে কৃত্রিম হাসি দিয়ে বলল—সেকেলে মানুষ, পুরোনো চিন্তা ভাবনায় চলেন। বললেন খবর না দিলে প্রতীক বসে থাকবে।

লিলি ছোট্ট উত্তর দেয়—ও!

প্রতীক পাশের ঘরে ছিল। ওদের কথাবার্তায় চেয়ার ছেড়ে লাফাতে লাফাতে চলে আসে। ফর্সা ফুলো ফুলো চেহারা, গায়ে 'নর্থ স্টার' লেখা সিল্কের গেঞ্জি, সর্টপ্যান্ট, হাতে একটা বালা। একগাল হেসে বলে—স্যার আসবেন না, কল্যাণীদি?

—না।

লিলি ধমক দিয়ে বলে—তুমি টাস্ক নিয়ে বসো। উইক্লি টেস্টে অঙ্কে ভালো করনি, মনে আছে? প্রতীক মায়ের এই অনুশাসনে খুব একটা গা করল না। মাস্টারমশাই আসবেন না, খুব মজা লাগছে তার।

—জানো কল্যাণীদি, আমরা ইন্টার ক্লাশ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, আমি কপিলদেব......। বোলিং করার ভঙ্গীতে খানিকটা ছুটে গিয়ে হাত ঘোরাতে থাকে। লিলি ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলল—প্রীতু! টাস্ক নিয়ে বসলে খুশি হব। বাপি বেরোবেন!

—স্যার কাল আসবেন? প্রতীক কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করে।

—আসতে বলব। শরীর ভালো থাকলে অসুবিধে নেই।

—কাল? কালতো তো তোমার অঙ্কস্যারের দিন। রুটিন ভুলে গেছ? লিলি মনে করিয়ে দেয়। প্রতি কথায় মায়ের হস্তক্ষেপ প্রতীকের ভালো লাগছে না। ব্যক্তিত্ব আহত হচ্ছিল। মুখে কিছু প্রকাশ করাও ভব্যতা নয়। একবার মায়ের দিকে তাকায়, ফের কল্যাণীকে বলে—আজ সন্ধ্যায় আসতে বলো কল্যাণীদি; কাল আমার গ্রামারের টাস্ক ছিল। লিলি এবার কিছু বলে না। অদ্ভুত ভঙ্গিতে ফ্রিজ খুলে খানিকটা দই নিয়ে গেলো প্রতীকের বাপির জন্য।

—বোসো, কফি খেয়ে যাবে। সুবিমলের ঘুম ভাঙ্গে নি মানদা?

ঝি বলল—ছোটবাবু বিছনাতেই দু দু কাপ চা খেয়েছে। বলছেলো বেরোবেনি আজ।

কল্যাণীর সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রখর। আশা করেছিল ছেলের প্রশ্নে লিলি প্রত্যুত্তর দেবে। এখন মনে হল বাবা সন্ধ্যায় আসুক এ বাড়ির লোকও চায়। কল্যাণী ডিসটেম্পার করা দেয়ালে মস্ত সাঁইবাবার বাঁধানো ছবিটার দিকে তাকাল। শান্ত, বরাভয় মূর্তি। লিলি একদিন বলেছিল বছরের একটি বিশেষ দিনে ফটোতে বিভূতির প্রলেপ পড়ে। লিলির অগাধ ভক্তি। কিন্তু লক্ষ্য করছে বাবা একদিন না আসায়, প্রীতুর গ্রামার টাস্কের জন্য লিলি কত সচেতন, হিসেবী। এখানে কোন ভাব ক্রিয়া করে না।

লিলি আবার এ ঘরে ফিরে আসতে, প্রতীকের প্রশ্নের জবাবে কল্যাণী শুনিয়ে শুনিয়ে বলল—তোমার মাষ্টারমশাই তো আজ সন্ধ্যায় আসতে পারবেন না প্রীতু! বুড়ো মানুষ, ছানি কাটিয়েছেন, সন্ধ্যার ট্রামেবাসে কি চলাফেরা করতে পারবেন? খুব সকাল ছাড়া উপায় নেই। তোমরা জানতে না?

ভেবেছিল লিলিই ছেলেকে বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু তার নীরবতায় সে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। লিলি উঠে যায় এ ঘর থেকে। হঠাৎ কল্যাণীর খেয়াল হল উত্তরটা ঠিক হল ত? 'তোমরা জানতে না?'-র মধ্যে

চাপা শ্লেষটুকু পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এখন কল্যাণীর কানেই খট্ করে বাজছে। হয়তো ঠিক হল না বলাটা। অনেক কিছুই তো সহ্য করতে হয় সেই পরিবেশে, বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে নিতে হয় মনের মধ্যে। এই শহর নগর গ্রামে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে সূর্য-গহ্বরের গ্যাসীয় অণু-পরমাণুর অহর্নিশ ভাঙ্গা গড়া মনের নীরব কুঠ্‌রিতেও চলছে। প্রাকৃতিক প্রলয়ের মত সশব্দে যখন তা ফাটে, সে অন্যকথা! কল্যাণী আহত অভিমানে ভাবে, সত্যিই বাবার যা বয়স, নতুন আর ট্যুশনি জুটবে না। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পুরোনো শিক্ষকরাও বাতিল, ব্যাকডেটেড। কিন্তু সংসারের প্রয়োজন তো তা শুনবে না। তবে কি সুবিমলের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্কে লিলি অখুশি? কেন? সে কি ভাবছে সম্পত্তির জন্য সুবিমলকে সে জয় করতে চাচ্ছে? লিলির চেয়ে শিক্ষাগত মান তার কম নয়। গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসে আছে, অনার্স অবশ্য ছিল না। বি. এডে ভর্তি হবার চেষ্টা করেছিল, পায়নি সুযোগ। কিন্তু লিলির শিক্ষার মান জানা আছে, ক্লাশ নাইনের দরজাই টপকাতে পারেনি। বাবার কাছে প্রফুল্লকাকা বলেনি? রূপ? কোন মেয়েই সহ্য করে না অন্যে অপেক্ষাকৃত রূপবতী।

তাই একটু বেপরোয়া ভঙ্গিতেই সে সুবিমলের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, মাঝপথে সুরঞ্জনদার সঙ্গে মুখোমুখি।

—কেমন আছিসরে তোরা? কাজে বেরোবার ব্যস্ততায় দাঁড়িয়ে কথা বলারও সময় নেই। —বোস, জুতোমোজা পরতে পরতেই তোর সঙ্গে কথা বলি। মাস্টারমশাই কেমন আছেন? প্রিয়দা?

—ভালো আছে।

—প্রিয়দার সঙ্গে মাঝে পার্কসার্কাসের মোড়ে দেখা হয়েছিল, তেমনিই আছে দেখলাম।

—না, দাদার শরীরও ভালো নেই, গ্যাসট্রিকের ট্রাবল, লো প্রেসার।

—সত্যি লোকটা পাল্টালো না। সেদিন বললাম, আদর্শ নিয়ে

এই তো হোল, এবার কিছু একটা কর! বই লেখে, বেশতো, পাবলিশিং কনসার্ন খুলুক, বলেছিলাম আমি লোন দেব। আজকাল বইয়ের বিজনেস্ মন্দ নয়। রাজিই করানো যায় না। রাজনীতি করছে আজকাল?

কল্যাণী ছোট্ট হেসে বলে—সরাসরি না করলেও একদম কি ছাড়তে পারে? এখন একটা ডেইলিতে আছে, ছোটখাট কাগজ, সব করতে হয়, বাইরের কাজে বিশেষ সময়ও পায় না।

—না, না, লোকটা খাঁটি। আমিতো বলি রাজনীতি-করা লোক দেখতে পারি না কিন্তু প্রিয়দা সেপারেট ম্যান! হুদোহুদো লোক গুছিয়ে নিচ্ছে, আমার কারখানার ইউনিয়ন দিয়েই তো বুঝতে পারি, কিন্তু প্রিয়দা অন্য ধাতুর। যাব একদিন তোদের বাড়ি, জ্যাঠাইমার সঙ্গে সেই ছাড়াছাড়ির পর দেখা হয়নি। বিজনেস নিয়ে একেবারে যন্ত্র হয়ে গেছি।

—কি বলেরে কল্যাণী? লিলি হাসতে হাসতে বলল—খুব হয়েছে, সময় তোমার কোনদিনই মিলবে না। সাড়ে আটটা বাজতে চলল, নীচে গাড়ি বার করা হয়ে গেছে!

—দেখলি তো, আমার অবস্থাটা দেখলি? নিজের ইলেকট্রনিক ঘড়িটায় সময় দেখে নেয়। আমার ব্রিফকেসটা রেডি?

—এ ঘরে এস। লিলি সুরঞ্জনের দিকে ছোট্ট হাসি দিয়ে বেড-রুমে ঢুকে পড়ে।

আস্তে রেডিওটা খুলে ইংরেজি কাগজটা নিয়ে আয়েসে বিছানায় কাত হয়ে ছিল সুবিমল। টেবিলটার সামনে খালি কাপ, এ্যাসট্রে থেকে সুতোর মতো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। দরজা দিয়ে ঢুকতেই সুবিমল বলে—এই সকালে? কি মনে করে? কাগজের আড়ালটা মুখ থেকে সরিয়ে টেবিলের দিকে ছুঁড়ে দেয়। জেঁকে বিছানায় বসতে বসতে ঠোঁটে তোলে একটা সিগেরেট।

—আলসেদের কাছে সকাল বটে, আমাদের দিন অনেক আগেই শুরু হয়।

কল্যাণী মৃদু হেসে আঁচলটি কাঁধের উপর দিয়ে সামনের চেয়ারে বসল।

—সি. এম. ডি-এর কনট্রাক্ট নিয়ে আয়েসি হওয়া যায় না। সুবিমল হালকা গুরু-পাঞ্জাবীটার বোতাম খুলতে খুলতে একটু রিল্যাক্স করে। ঘন লোম দেখা যায় বুকের।

—রাখো! ট্রামেবাসে অফিসযাত্রী উপচে পড়ছে আর এখানে আয়েস করে খবরের কাগজ পড়া হচ্ছে!

—আজ তো ছুটি, বেরোবো না। নইলে এতক্ষণ আমি স্কুটারে।

—ব্যবসার আবার ছুটি কি?

—কাল একটু বাইরে যাবো, শিলিগুড়ি। মাষ্টারমশাইয়ের কি হয়েছে? এলেন না যে?

হঠাৎ কল্যাণীর চাপা রাগটা অভিমানে ফেটে পড়ল। লিলিকে যে জবাবগুলো দিতে পারেনি, সুবিমলের সামান্য কথায় সোডার বোতলের মতো উপচে ওঠে।

—আসেনি বেশ করেছে। কৈফিয়ৎ দিতে হবে? বাবা কাউকে কৈফিয়ৎ দেন না।

—ছিঃ ছিঃ, কৈফিয়ৎ চেয়েছি? প্রীতু কি বলছিল তাই জিজ্ঞেস করলাম।

—তোমরা কৈফিয়ৎ দাও? আজ যে বেরোবে না, তার জবাব-দিহি করতে হবে তোমায়?

—তোমার কাছে করলাম যে? সুবিমল হাসে। খেপলে কেন?

—খুশি হল তাই খেপলাম। এবার কল্যাণীও হাসে। হাসলে কল্যাণীকে সুন্দর লাগে। কপালের একটি রগ স্পষ্ট হয়, গালে টোল পড়ে এবং পাতলা ঠোঁট জোড়া ঈষৎ ফাঁক হয়ে যায়। এই অভিমানের হাসিটি সুবিমলকে দিশেহারা করে তুলল। সে ঝপ করে উঠে 'পাগল!' বলেই দুহাতে কল্যাণীকে জড়িয়ে ধরে পাতলা নরম ঠোঁটে নিজের ঠোঁটজোড়া ঠেসে ধরল। কল্যাণী দুহাতে মুখটা ঢাকতে গিয়েও পারল না। সুবিমল সবলে হাতদুটো সরিয়ে রাখল।

কিছু পর হাসতে হাসতে সুবিমল বিছনায় বসতে, কল্যাণী একবার দরজার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল। সুবিমল খুঁটিয়ে দেখল কল্যাণীর শামলা রং ভেদ করে ঈষৎ আবেগ ফুটে উঠেছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাসি গল্প মান অভিমান চলল। চা হল একবার, সুবিমলের এ্যাসট্রেতে আরও কয়েকটা সিগেরেটের টুকরো ঠুসে দেয়া হল। রাস্তায় যানবাহনের হর্ন, কর্কশ আওয়াজ—মনে হয় সহরে অফিস-ব্যস্ততার হাঁসফাঁস শুরু হয়ে গেছে।

—আর নয়। এ জন্যই আসি না। আমাদেব আয়েসি হলে চলবে না। খোকার স্কুল আছে, নিয়ে যেতে হবে।

—রাখো! বালিগঞ্জের মেয়েবা আবার খাটিযে। হাসালে।

কল্যাণী বলতে চাইছিল জবাবটা। রেখে ঢেকে, বাঁকাভাবে বললো—বালিগঞ্জ থাকার অনেক সুখ, তাই না?

—নতুন করে জানলে? থাক্, খোকাদেব স্কুল বাস নেই? তুমি যাচ্ছ যে?

—গাড়ি? হ্যাঁ, আছে। হেসে কপট ভঙ্গিতে কল্যাণী বলে, ও পেট্রোলের গন্ধ সইতে পারে না।

—তা ভালো। চলো গড়িয়াহাট পৌঁছে দিই তোমায়।

—কেন? বাস ট্রাম চলছে না?

—পাগল! শহরের ট্রান্সপোর্টে মেয়েদের নিরাপত্তা আছে? বিশেষ করে অফিসের ভীড়ে? মানুষ কি কবে যে নিজেদেব বউ মেয়ের ওঠানামা সহ্য করে? আমিতো ভাবতেই পারি না!

—আমাদের সয়ে গেছে।

—সয়ে যায় নি। বলো বাধ্য হয়েছো।

—একটা কিছু হবে।

স্কুটারের পিছনে বসিয়ে কল্যাণীকে নিয়ে আসতে আসতে সুবিমল অফিস-টাইমের কলকাতা দর্শন করাল। এ কোন নতুন দৃশ্য নয়। বহু দিন কল্যাণী এ সময়ে পথে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছে কিংবা অফিস-সময়ে কাজ পড়লে সরাসরি দহন-যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছে।

তবুও প্রকাশ্য রাজপথে গতিময় বাহনে চেপে এমনভাবে নরনারীর সহ্যক্ষমতা এবং লোমহর্ষক কলাকৌশল দেখে মনে মনে শিউড়ে ওঠে সে। আঁচলটা উড়ছে কল্যাণীর, ডান হাতে সংজ্ঞ ভঙ্গিতে সুবিমলকে ধরে সে হুস্‌হাস্ চলে যাওয়া গোঙানো বাসট্রামগুলো দেখছিল। মিনি, স্পেশাল, ট্রাম, ডাবলডেকার যেন ভয়াবহ মাংসপিণ্ড হয়ে সগর্জনে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। চিন্তাভাবনা বা কোন অপেক্ষার সময় নেই। যুদ্ধক্ষেত্র। দিনে দিনে শহরটা ক্রমশ অপরিচিত ও অনভ্যস্ত হয়ে উঠছে। ঘাম, ভীড়, ধোঁয়া, খোঁড়াখুঁড়ি ও বিজ্ঞাপন—একটা ক্যানসারাস গ্রোথের মত সভ্যতা আধুনিক হয়ে উঠছে।

গড়িয়াহাটাব মোড়ে দাঁড়িয়ে কল্যাণী হঠাৎ প্রশ্ন করল—কমলেশ বাবুর সঙ্গে কেমন পবিচয়? সুরঞ্জনদার পার্টনার?

—হঠাৎ কমলেশদার কথা?

—আমাদের বাড়িওলা।

—জানি, এককালে শুনেছি আমাদেরও ছিল, তা হঠাৎ?

—একটা কথা বলব তোমায়, জরুরি।

কল্যাণী চারপাশে তাকাতে, স্কুটারে চাবি দিয়ে সুবিমল বলল—চলো, একটু চা খাওয়া যাক্। পর্দার আড়ালে বসেই কথাবার্তা হল।

—বলছিলাম, একটু জিজ্ঞেস করবে বাসাটা নিয়ে কি ভাবছে?

—কেন?

কল্যাণী বিস্ময়ে সুবিমলের দিকে তাকায়। তার এই অজ্ঞের মতো কেন জিজ্ঞাসার কোন মানে নেই। ওরাও তো একসঙ্গে এক বাসায় সুখদুঃখ ভাগাভাগি করে নিয়েছিল, ভাগ্যের পরিবর্তনে ভুলে গেল সব? তখনই তো বাসার অবস্থা ছিল নখদন্তহীন গলিতবৃদ্ধের মত। আজ পঁচিশটি অতিরিক্ত বর্ষার আক্রমণে কি অবস্থা হতে পারে? অবশ্য সুবিমলের জ্ঞানই ছিল না তখন।

কল্যাণীর নিশ্বাসটুকু ধরতে পেরেই সুবিমল সামলে নিয়ে বলে—না না, বাসার কনডিশন তো জানি, নতুন কিছু ঘটেছে?

—উঠিয়ে দিতে মামলা করেছে। এ ভাবে মানুষ থাকতে পারে?

সুবিমল গম্ভীর হয়ে খুলে বলল—মনে করিয়ে ভালোই করেছ। সে দিন কমলেশ আমাকে পেয়ে কয়েকটা কথা বলল—

—বলনি তো?

—বলার নেই কিছু, শুনে তোমাদেরও ভালো লাগবে না।

—তবু মানবিকতা? তাও থাকতে নেই? কাল সারারাত বাসাব কেউ ঘুমোতে পারে নি।

—হ্যাঁ, এটা ওর প্রেসাব। বললো বাড়িটা বিক্রি করে দেবে। তিরিশ বছরের কাকুলিয়া আর নেই, নতুন কলকাতার ম্যাপে নাকি সফিষ্টিকেটেড এলাকা। জমির দাম উচ্চবিত্ত বাঙ্গালীর বাইরে। এক মাড়োয়ারী ওকে খুব লোভ দেখাচ্ছে, তিন লাখের উপর অফাব। হোটেল, বার, রেসে খুব খাওয়াচ্ছে ঘোরাচ্ছে কমলেশকে।

—কমলেশবাবুর ওপিনিয়ন?

—সহজ সরল! কলকাতা মানে স্ট্যাটাসের পাল্লা। লাখ তিনেক টাকা চাড্ডিখানিক কথা? ও থমকে আছে আরও বেশি দাও মারার জন্য। মেট্রোরেল আর বাইপাস্‌টা হয়ে গেলে পাঁচলাখ অনায়াসে পাবে। এ কেউ ছাড়ে?

—আর আমাদের তিরিশটা বছর?

—কল্যাণী, প্লিজ, আমার অত মাথায় ঢোকে না।

—বেশ, তবুও বোলো, অন্তত সে কটা দিন বাসাটা একটু সারিয়ে দিক?

—ক্যানো, প্রিয়নাথদা কিছু বলেনি? তিরিশ টাকায় কাকুলিয়ায় থাকা যায়? সিমেন্ট বালি লাগালেই দশগুণ ভাড়া বাড়বে। যাক্‌ আমি একবার রিকোয়েষ্ট করব, জানি না কতটা ডাল গলবে। সম্পত্তির ব্যাপার বড় জটিল।

কল্যাণীর মুখে একঝলক ব্যঙ্গের হাসি—আমরাই শুধু সরল রয়ে গেলাম। চায়ের দাম মিটিয়ে ,দেখাসাক্ষাতের দিন নির্দিষ্ট করে যে যার পথে ফিরে গেল।

৪

এই দুই পরিবারের সংক্ষিপ্ত একটু ইতিহাস আছে। ইতিহাস বলতে যে গৌরবগরিমার কথা বোঝায় তা অবশ্য নয়। দেশীয় রাজ-রাজরা বা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের পেছনে বিশিষ্ট পরিবার বা বংশলতার সঙ্গে তুলনাই হয় না। তবুও বলা যায় ইতিহাস। মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ, ভাবনা-চেতনার অগণিত স্রোতসমুদ্রে আদিনাথ ও প্রফুল্লবাবুর দুটি পরিবার বিন্দু। সাত চল্লিশের দেশবিভাগকে যারা ভেবেছিল অলীক, ক্ষণস্থায়ী, আদিনাথ অন্যতম। জন্মভূমি, যাকে তিনি ভালবাসেন, যার ধুলোয় মিশে আছে বংশপরম্পরার ভস্মরেণু, যার রসে-রূপে তিনি তার জীবনের ভাব ভাবনা ও প্রত্যয় গড়ে তুলেছেন, কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। পার্টিশনের সঙ্গে সঙ্গে চিরজীবনের জন্য গ্রামের সম্পর্কত্যাগকারীদের বহু বুঝিয়েছিলেন, কান দেয় নি তারা। হতে পারে আদিনাথ গ্রামের সম্মানীয় ব্যক্তি, শিক্ষক, কিন্তু জীবনের শিক্ষা আরও বিচিত্র। একটু সম্পন্ন পরিবাররা একে একে গ্রাম ত্যাগ করে গেল। হতশ্রী, উৎকণ্ঠা এবং সন্দেহের বাতাবরণে দিন রাত গড়াতে শুরু করেছিল। একদিন প্রফুল্ল এসে বলেছিল—দাদা কি করি?

—পাগল! এ সব ভাগ-টাগ দুদিনের! বাপ-ঠাকুরদার ভিটে ছেড়ে কোথায় যাব?

প্রফুল্ল কালেকটরিতে কাজ করত। অফিসে অপ্‌সন আসছে, কে কোথায় যেতে চায়, এপার না ওপার।

—কি করি দাদা, অপশন চাচ্ছে যে?

—খেপেছো, লিখে দাও তুমি এখানে থাকবে। প্রফুল্ল সেই সন্ধ্যায় আদিনাথের উঁচু বারান্দায় বসে চিন্তার রেখাজালে ঝিমোচ্ছিল। সত্যিইতো কোথায় যাবে, মাস্টার কি না জেনেশুনে বলছে?

প্রফুল্ল অপশন দিয়েছিল ওপারে থাকার। কিন্তু জীবনের ঐতিহাসিক ঘূর্ণিবাত্যায় মাস ছয়েকের মধ্যেই ওপার বাংলার অখ্যাত অজ গাঁয়ের ছুই পরিবার বুঝতে শুরু করেছিল সময় তাদেরকে অনেক পিছনে ফেলে ছুটছে। প্রফুল্ল অফিসে কাজ করতে পারছে না, আদিনাথের স্কুলে ছেলে নেই, গাঁয়ের যে মানুষরা সম্মান ও সম্ভ্রমে কথা বলত, অদ্ভুত ভঙ্গিতে পাল্টে গেছে। চোখের সামনে সম্পত্তি লুঠ হচ্ছে, পড়শির কাছে প্রতিবাদ জানালে তারা রহস্যজনকভাবে নীরব। অনুক্ত জুলুম শুরু হয়ে গেছে। পুলিশ, আইন শৃঙ্খলা অত্যন্ত পরিহাস হয়ে উঠছে সন্ধ্যার পর গাঁ ছম ছম করে। প্রফুল্ল আসে—মাস্টার, কি মনে করছ ?

—ভাবছি। কি বল, ঠিক হয়ে যাবে না ?

—বড় মেয়েকে গতকাল পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার ভাল লাগছে না।

—পাঠিয়ে দিয়েছ ? আমি কিন্তু এখনও আশা রাখি। আমার ছাত্র আসরাফ কালও বলে গেল ভয় পাইবেন না।

তিনমাস পর এই আসরাফ গোপনে ডাকিয়ে এনে যেদিন বলল—মাস্টারমশাই আর ভরসা পাই না। আপনাগো পথ দেইখ্যা লন ! সমস্ত পৃথিবীটা বিপর্যস্ত বিশ্বাসের অন্ধকার পটভূমিকায় উঠেছিল ছুলে। প্রতিহিংসার দাবানলে সেদিন আদিনাথের জন্মভূমি পুড়তে শুরু করেছে। শহরে শহরে রক্তের ছোপ তৈরী হচ্ছে। একবস্ত্রে বাসভূমি ত্যাগ করতে হবে, সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি ওপারের মানুষদের। আদিনাথের চোখের সামনে একছপুরে কলার ছড়া আর পুকুরের মাছ নিয়ে গেল। দেহ কাঁপছিল ক্রোধে। প্রিয়নাথের স্কুল জীবন শেষ হতে বাকি ছিল ছুটো বছর। প্রফুল্লকে ডেকে বলল—কাকা এরপর গাঁয়ে পড়ে থাকার আগে মরণের জন্য প্রস্তুত হোন। বাবাকে বোঝাতে পারেন কিছু ?

আসরাফ লবণের মর্য্যাদা দিয়েছিল। নিজের আসন্ন বিপদ তুচ্ছ করে ছুই পরিবারকে টাউনে এনে লুকিয়ে রেখেছিল চাচার বাড়ি।

চাচার সঙ্গে আসরাফের দিনরাত ফিসফাস্ কথা হত নীরজাদেবীর সারাদিন মনে হত, খিড়কি দিয়ে লোক ঢুকছে। চারদিকে শুধু হত্যা, বলাৎকার, ভেসে যাওয়া পরিবারদের করুণ কাহিনী। এর পর গুজব! কালো লোমশ শরীর নিয়ে শহর, বন্দর, নগরে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাতে কার্ফু! স্টিমারে যে খুলনা পৌঁছাবে, তার টিকিট? একখানি স্টিমার, হাজার হাজার যাত্রীর ভীড়ে ষ্টিমার-ঘাটা নরককুণ্ড। পুলিশের এলোপাথাড়ি লাঠিচালনা। আসরাফের চাচা বলল—কত্তা, টিহিট তো পাইবেন না। টিহিট দিবো না আপনাগো, ব্ল্যাক হইতেছে!

—আপনি পারেন না ব্যবস্থা করতে?

—কথা দিতে পারি না। আমার স্যাঙ্গাৎ আছে কোম্পানিতে, ট্যাহা দিয়া দেন, দেহি কি করা যায়!

আদিনাথ আর প্রফুল্ল পরস্পর তাকিয়েছিল কি করবে! এতো অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত! কিন্তু উপায় নেই, এখানে সন্দেহ থাকলেও প্রকাশ করা যাবে না, সব ভাগ্য! প্রিয়নাথ আর সুরঞ্জন প্রায় সমবয়সী, ওদের ভয় বেশি, তাই বাড়ির বাইরে যেতে দেয়া হয় না ওদের। নীরজাদেবী এবং প্রফুল্লর স্ত্রী খিচুড়ি রাঁধে, হা হুতাশ করে আর গোপনে পরিকল্পনা করে কতটুকু সম্পত্তি পোঁটলাপুটুলিতে গোপন করে নেয়া যায়। তারাও তখন বউমানুষ, ভয় তো তাদেরকে নিয়েও।

পরদিন আসরাফের চাচা এসে বলেছিল—কত্তা, টিহিটের টাহা দিয়া দিছি, পরশুর ইষ্টিমারে। সন্ধ্যার পর গিয়া পিছন দরজায় টোকা দিবেন, একটা লোক বাইরাইবো, শুধু কইবেন, আসরাফ!

সন্ধ্যার পর ষ্টিমারঘাটা অন্ধকারে ঘুটঘুট করছিল। নিজের হাতই স্পষ্ট হয় না। হাজার হাজার লোক ঐ অন্ধকারে থিক থিক করছে। যাত্রী, পুলিশ, গুণ্ডা, লোভী! আইন-শৃঙ্খলাবিহীন এক নারকীয় পরিবেশ! এখানে কোথায় টিকিট পাবে? অসহায়ের মতো দুটি পরিবার নিজেদের মালপত্র সামলে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে

কাঁপছিল। সুরঞ্জনকে দাঁড় করিয়ে প্রিয়নাথ গিয়েছিল টিকিটের সন্ধানে। নীরজাদেবী ভয়ে বোবা। হাজার মানুষের ভিড় ঠেলে, অন্ধকার খানাখন্দর পেরিয়ে পেছন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল প্রিয়নাথ। যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে রক্ষে নেই। রুদ্ধ কপাটে তিনটে আওয়াজ করতেই একটা লোক বেরিয়ে এল। আসরাফ! যন্ত্রের মতো লোকটা টিকিটের গোছা হাতে তুলে দেয়। প্রিয়নাথের হাত কাঁপছিল, আসরাফের চাচা কথা রেখেছে। কিন্তু এ টিকিট নিয়ে এগোবে কি করে? যদি পুলিশ চ্যালেঞ্জ করে কিংবা অন্য যাত্রীরা লুঠ করে নেয়? ছোট্ট আটহাতি ধূতির কোচড়ে সযত্নে টিকিট বেঁধে প্রিয়নাথ চলে এসেছিল।

ষ্টিমারে তখন কাতারে কাতারে মানুষ, বাক্সপ্যাটরা বোঁচকা গুতোগুঁতি ঠেলাঠেলি করে উঠছে। পুলিশের মর্জিমতো চলছে লাঠি।

আদিনাথ বললেন—ফেলে দাও, সব মাল ফেলে দাও, কি হবে এত কষ্ট করে! কেউ রাজি হয়নি সেদিন। প্রফুল্ল বলেছিল—না মাস্টার, ওপার গিয়ে লাগবে না কিছু? কিছুইতো নিতে পারলাম না। —জন্মভূমিকেই ফেলে দিয়ে যাচ্ছ, আর মালপত্তর? নীরজাদেবী অন্ধকারে কেঁদে ফেলেছিল সেদিন।

খুলনার রেল স্টেশনেও এক অবস্থা। কুলীরা খুশিমত দাম চায়, কথার কোন ঠিক নেই। মাল সার্চের নামে সমস্ত প্ল্যাটফর্মে বাক্স প্যাঁটরা লণ্ড ভণ্ড। তারা যদি বলে এটা নিতে পারবেন না, তাই বেদ-বাক্য। মোটা টাকা ঘুষ দিলে ছাড়। টাকা উড়ছে খুলনা স্টেশনে।

সমস্ত ট্রেনখানায় শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা, মানুষের অন্ধকূপ হত্যার মত। কোন কামরায় আলো ফ্যান জল নেই। কখন যে ট্রেন ছাড়বে অনিশ্চিত। হঠাৎ ওদের খেয়াল হল সব মাল উঠলেও মুড়ির টিন ওঠেনি। ওই দমবন্ধকর পরিবেশ ফুঁড়ে সুরঞ্জন নেমে এসেছিল প্ল্যাটফর্মে। আঁতিপাতি করে খুঁজল, যেখানে কুলীটা মাল-পত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল। দেখে মুড়ির টিনটা অন্ধকারে উল্টে

পড়ে আছে, ভুলে খেয়াল হয়নি। হাঁকাহাঁকি, চিৎকার, কান্নার রোল চলছে চারদিকে। কোন পরিবারের মা বাপ ভাই ট্রেনে উঠেছে, বোনটিকে কারা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গেছে, এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। হয় তো কোন বউ-এর জন্য স্বামী শ্বশুর পাগলের মতো হাঁকাহাঁকি করছে, সময় নেই, ট্রেন ছাড়বে। সুরঞ্জনের হাতে মুড়ির টিন, নেমে গেছে দুশ্চিন্তার বোঝা। সমস্ত টাকার তোড়াটাই পুঁটুলি করে মুড়ির তলায় ছিল।

অনেক কষ্টে লাথি গুঁতো খেয়ে জায়গায় এসে দেখে নীরজা-দেবী বিলুপ্ত সংজ্ঞায় মায়ের কোলে কোন রকমে মাথা দিয়ে আছে। প্রিয়নাথ বেরিয়েছে জলের খোঁজে।

—কেন, জলের ঘটি আর পাখা? সুরঞ্জন কাঠ-গলায় জিজ্ঞেস করেছিল। আসার সময় মা আর জ্যাঠাইমাকে বলেছিল—আপনাদের কিছু নিতে হবে না। একঘটি জল আর পাখাটা রাখবেন। ট্রেনে লাগবে। ট্রেনের বীভৎস, পৈশাচিক পরিস্থিতিতে সেই ঘটির জল-টুকুই উল্টে গেছে, হাতপাখাখানা গেছে দুমড়েমুচড়ে। জল কোথায়? কোথায় গেছে প্রিয়দা? —সুরঞ্জন বাইরের পরিস্থিতির কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। প্রফুল্ল বলে উঠেছিল—বাইরে গেছে জল আনতে।

প্রিয়নাথের জল সংগ্রহের প্রচেষ্টা ছিল আরও ভয়াবহ। আদি-নাথ সংজ্ঞাহীন নীরজাদেবীর উদ্দেশ্যে যখন বলে উঠলেন—হায়, এক ফোঁটা জল! প্রফুল্ল, বুকটা আমার কারবালার মতো! তখনই প্রিয়নাথ ট্রেনের উল্টোদরজা দিয়ে ঘটিটি হাতে নিয়ে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়েছিল পাথরের উপর। জানে না ওখানে লোহা, পাথর গজাল, তার, কি আছে, পা দুটো গুঁড়ো হয়ে যেতে পারত। হয়ত তীব্র প্রয়োজন মানুষকে সাহসী করে তোলে। উঠে দাঁড়িয়ে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে দরজা গুনে গুনে লাইন ধরে এগোতে লাগল। নইলে অন্ধকারে কামরার হদিশ মিলবে না। লক্ষ্য করছে দূরে দূরে অন্ধকারে শ্বাপদের মতো রহস্যজনক বেশকিছু মানুষের চলাফেরা। প্রিয়নাথের সেদিকে

খেয়াল নেই। এখন শুধু এ কিশোরের লক্ষ্য জল। জানে লাইনের শেষে একটা জলকল আছে। হঠাৎ ঝপ্ করে পড়ে যেতেই পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। মনে হল কে যেন পায়ের হাড় গুড়ো করে দিয়েছে। মা গো! অস্ফুট আর্তনাদ ওঠে। লাইনের তলে মস্ত ড্রেনটা প্রিয়নাথ অন্ধকারে অনুমান করতে পারেনি, পড়ে যেতেই দূর থেকে লাঠি হাতে ছুটে এসেছিল পুলিশ। চুলির মুঠি ধরে টেনে তুলতেই প্রিয়নাথ আকুল মিনতি করল—আমি চোর গুণ্ডা নই! এই দেখুন ঘটি, এক ফোঁটা জল না হলে মা মারা যাবে।

—এই অন্ধকারে জল? শুয়োরের বাচ্চা!

—বিশ্বাস করেন। আমি এখুনি জল আনছি!

কেন জানি, পুলিশটির দয়া হল প্রিয়নাথের উপর। ছেড়ে দিতেই প্রিয়নাথ এগিয়ে যায়। মনে মনে ভাবে, ভগবান, আর কত জমিয়ে রেখেছ ভাগ্যে! আবার সেই দরজা গুনে গুনে ফিরে আসা। জলটুকু নীরজাদেবীর গলায় পড়তেই সম্বিৎ ফিরে পায় সে। আরও ঘণ্টাখানেক কর্তাদের খানা-তল্লাসির পর ট্রেন ছেড়ে দিল। চিরদিনেব মত বিদায় দিচ্ছিল সবাই জন্মভূমিকে। আদিনাথ মূক গম্ভীর। মালপত্র, টাকাপয়সার প্রতি কোন লোভ নেই তার। শুধু প্রফুল্লর বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। কি নিপুণ সযত্নে সোনাদানা, টাকা নিয়ে চলেছে, সেই জানে, আর তার বউ। মাঝে মাঝে আদিনাথেব অনাসক্তিতে সায় দিয়ে বলছিল—আমিও নেই নি মাস্টার! সবই যখন ওলটপালট হয়ে গেল, কি হবে ছিঁটেফোটা সম্পত্তিতে? আদিনাথের শুধু চাপা দীর্ঘনিশ্বাস। কত স্মৃতি, কত টুকরো ঘটনা ভাসছিল তাঁর চোখের সামনে। মনে হচ্ছে, এই যন্ত্রণাভোগ, দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া সব যেন স্বপ্ন। আহা, সত্যিই যদি স্বপ্ন হত! ঘুম ভেঙ্গে দেখতেন তাঁরা গাঁয়ের বাড়িতেই আছেন!

বেনাপোলে পৌঁছে শেষ খানাতল্লাশি। উৎকণ্ঠা, প্রত্যাশার চরম লগ্নে যেন হাজার হাজার মানুষ ফেটে পড়বে। শেষ সুযোগ হাতিয়ে নিতে যে যার খুশি মাল টেনে ফেলছে, আটকে রাখছে,

গড়িয়ে দিচ্ছে প্ল্যাটফর্মে! কে একজন কালো হুমদো মত লোক কামরায় উঠে প্রফুল্লর স্ত্রীর মস্ত পানের ডিবেটা ছিনিয়ে নিল। রূপো বাঁধানো ছিল ওটা। মনে হয় প্রফুল্লর স্ত্রীর হৃদয়টি কে যেন বর্শা দিয়ে ফুটো করে দিয়েছে। সে কেঁদে উঠেছিল, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। আদিনাথ বললেন—বৌমা, মানুষই হারিয়ে যাচ্ছে, ওতো সামান্য পানের ডিবে! মন খারাপ করনা। এক পরিবার গুম মেরে ছিল এতক্ষণ, বৃদ্ধা মা কেঁদে উঠেছিল—পারুল! আমার পারুল রে! খুলনায় তরে থুইয়া গেলাম! টিকিট কেটেছিল সবাই একসঙ্গে, ট্রেনেও উঠেছিল, হঠাৎ জিজ্ঞাসাবাদের ছুতোয় কারা যেন পারুলকে নিয়ে গিয়েছিল, আর ফিরিয়ে দেয়নি।

ট্রেন শব্দ করে ছুটছিল। হঠাৎ চিৎকার আর ঝাঁকে ঝাঁকে উলু-ধ্বনি। চিৎকারও ঠিক নয়; আনন্দে, ক্রোধে, দুঃখে ভাষাহীন উল্লাস। সীমান্ত পেরিয়ে গাড়ি এ দেশে ঢুকছে! উলুধ্বনিতে কান পাতা যায় না। আবেগে অশ্রুতে যে যাকে পারছে জড়িয়ে ধরছে। বাতাস নিচ্ছে প্রাণ ভরে।

বনগ্রাম স্টেশনে এক অদ্ভুত দৃশ্য। কিশোর প্রিয়নাথ বোবা বনে গিয়েছিল সেদিন। প্ল্যাটফর্মটা মাছির মত মানুষে থৈ থৈ করছে। ছোটাছুটি, চিৎকার, খোঁজাখুজির অবর্ণনীয় ভীড়। প্রিয়নাথ লক্ষ্য করল, মানুষ পরস্পরকে পাগলের মত আবেগে জড়িয়ে হাসতে হাসতে ডুকরে কেঁদে উঠছে। আবার সেই কাঁপা কাঁপা করুণ ডাক —পা-রু-ল! পারুল রে!

প্রফুল্লর স্ত্রী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মরণকান্নায় ফেটে পড়ল—আমার পানের ডিবা! বুক চাপড়াচ্ছে প্রকাশ্যে।

—বৌমা, থামবে! আদিনাথ বোঝায়। মানুষ তো যায় নি, সামান্য পানের ডিবে। প্রফুল্ল হাত ধরে বোঝায়—কাঁদ কেন, আমি রূপার ডিবা বানিয়ে দেব।

—না গো না! সে কাঁদতেই থাকে। —খিলিপানে আমি বিছা-হারখান রাখছিলাম। বিয়ার হার আমাগো! বাবার দেয়া হার!

পোড়াকপাইলারা রাইখা দিলি? প্রফুল্ল নির্বাক। আদিনাথ মুখ ফিরিয়ে অসংখ্য নিঃস্ব মানুষের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। সমস্ত প্ল্যাটফর্মে পচা গন্ধ, গা গুলিয়ে ওঠে, ব্লিচিং ছড়াচ্ছে ভলান্টিয়াররা, জল হাতে সাহায্যের জন্য ছুটে আসছে।

তবু গন্ধ যায় না, রোগের বীজাণুরা কেবলই ছড়ায়। এ অবস্থায় আদিনাথের ওসব খেয়াল নেই। অবাক বিস্ময়ে আকাশ, গাছপালা, ঝোপঝাড় আর মাটির দিকে তাকিয়ে ভাবেন, এই তাদের নতুন দেশ, জন্মভূমি, স্থায়ী ঠিকানা।

একবালে গাড়ি পৌঁছেছিল শিয়ালদা ষ্টেশনে। যত যাত্রী নেমেছিল গাড়ি থেকে তার একশ গুণ ভীড় জমিয়েছিল আত্মীয়স্বজনকে খুঁজে বার করার জন্য। ঢেউয়ের মত মানুষ আছড়ে পড়ত এক একটা গাড়ি সীমানার ওপার থেকে হাজির হলে। বাইরে ভারত সেবা-শ্রম সংঘ, হিন্দু মহাসভা, রামকৃষ্ণ মিশন—নানান সংঘের ভলান্টিয়ার। প্ল্যাটফর্মে পা রাখার জায়গা নেই। ভীড় সামলাতে পুলিশের কর্ডনিং টিয়ারগ্যাস লাঠি! এখানেও অন্ধকার কার্ফু! তবু মরণের ভয় নেই। থেকে থেকে উত্তেজনা ওঠে—অমুক গাড়িতে শাঁখা ভাঙ্গা, রক্ত, কাটা-আঙ্গুল পাওয়া গেছে। সে কি উত্তেজনা!

ওরা দুটো ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে প্রথমে উঠেছিল প্রফুল্লর এক বন্ধুর বাড়ি বৌবাজারে। আদিনাথের কোন আত্মীয় বা পরিচিত ছিল না এ বিশাল শহরে। প্রফুল্ল বলেছিল—মাষ্টার, ভেবোনা কিছু, আগে একটা আশ্রয়ে উঠি। ভদ্রলোক আদরযত্নে চারদিন রেখেছিল বাড়িতে। সেই প্রথম দুই পরিবারের মানুষ অনুভব করেছিল, তারা বেঁচে আছে। দোকান থেকে কিনে নতুন কাপড় পরেছে, সাবান দিয়ে স্নান করে মাছের ঝোল আর সরু চালের ভাত খেয়ে অকাতরে ঘুমিয়েছিল। এতদিন লাভলোকশান, ফেলে-আসা ভূখণ্ড বা সম্পত্তির চিন্তা খুঁটিয়ে দেখার মানসিক অবস্থা ছিল না। একটু ধীরে ধীরে হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করে। আদিনাথ বলেছিলেন—প্রফুল্ল একবার আশ্রয়ের খোঁজ কর। যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা,

সে ভদ্রলোকের বন্ধু কমলেশের বাবা ললিতবাবু। ললিতবাবুর এক-খানা বাড়ি ছিল কাকুলিয়ায়। ললিতবাবু কলকাতার লোক, শ্যামবাজারে থাকে। কাকুলিয়ায় বাগানবাড়ি করবে বলে ছোট্ট এক-তলা বাড়িখানা করেছিল। ইচ্ছে ছিল বাড়িখানা তৈরী করে, আশ-পাশের জমি কিনে বাগানবাড়ি তৈরী করবে। পুকুর থাকবে, ফলের চাষ করবে, অবসরে কলকাতা ত্যাগ করে দিন পাঁচ-সাতের জন্য বিশ্রাম করবে। তা আর হয়ে উঠেনি ; উনিশশো ছাব্বিশে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকায় সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়। ঐ দিকটায় মুসলমানদের বাস ছিল তখন। সেই থেকে বাড়ি খানা পড়েই আছে। মাসিক তিরিশ টাকায় এই দুই পরিবার যখন উঠে গেল, ললিতবাবু যেন হাতে চাঁদ পেলেন। বাড়িখানা পোড়ো হবে না, উপরন্তু মাসিক তিরিশটি টাকা। সে বাজারে তিরিশ টাকার মূল্য অনেক। বন কেটে বসত না হলেও প্রফুল্ল আর আদিনাথ মাস্টারের কাছে ঐ টুকু আশ্রয়ই যথেষ্ট। ছিন্নমূলরা এর চেয়ে বেশি কি প্রত্যাশা করতে পারে।

এ বাসাতেই সুবিমলের জন্ম এবং পাঁচ ছ বছর পর কল্যাণীরও। কার্নিশের বাড়ন্ত বটগাছটি তখন ছিল না, কিংবা ছিল না ছাদের ফাটল, ঈষৎ হেলে পড়া দেয়াল। এখন মঞ্জুর যে ঘরটা—প্রফুল্লবাবুরা থাকতেন, আদিনাথের ঘরটি তেমনই আছে। এ বাসায় পা দেয়ার পর থেকেই প্রফুল্লর গোপন পরিকল্পনা ছিল যেমন করেই হোক জীবনে দাঁড়াতে হবে। পার্টিশনের পর চাকরিতে অপশন দিয়েছিল ওপারে থাকবার, তাই কলকাতার হেডঅফিসে যখন জানাল সবকিছু, তারা আইনের প্রশ্ন তুলেছিল। প্রফুল্লবাবু তুলেছিলেন মানবিকতার প্রশ্ন। ছ'মাস লিভ-ভ্যাকান্সিতে জলপাইগুড়ি রেঞ্জে কাজ করে ফিরে আসার পর, সেই একই প্রশ্ন এ দেশে কাজ করার অপশন নেই। প্রফুল্ল জীবনের এত বড় ভুলের জন্য আদিনাথকে অবশ্য অনুযোগ করে নি। মনে মনে তৈরী হচ্ছিল এই কলকাতা শহরেই মাথা উঁচু

করে থাকতে হবে, যেন-তেন-প্রকারেন। সেদিন, পঞ্চাশের গোড়ার দিকে এ পরিকল্পনা বুক ঠুকে বলা যেত না। পুরোনো মূল্যবোধ ভাঙেনি, জীবনের আঙিনায় আদর্শ তখনও বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের রশ্মিচ্ছটা বুলিয়ে দিচ্ছিল। সাধারণ মধ্যবিত্তের মধ্যে ঘুষ খাওয়া ছিল গোপনে, দশটা লোককে না জানিয়ে। প্রফুল্ল তাই মনে মনে ঠিক করেছিল যেমন করেই হোক দাঁড়াতেই হবে। আদিনাথ ছিল উল্টো। কেমন নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। জলাভূমি, রেললাইন, খাটাল যাই হোক না কেন, সুতানটি, টাউন কলকাতার মানুষ যতই অবজ্ঞা করুক, কাকুলিয়াই তাদের সঠিক ঠিকানা, জন্মভূমি, দেশ—যাই বলা যাক না কেন। গড়তে হবে এলাকাকে তৈরী করতে হবে। স্কুল গড়লেন, পল্লীমঙ্গল সমিতির ঢঙে সংগঠন করলেন, ঘটা করে স্বাধীনতা দিবস পালন করতে লাগলেন। প্রিয়নাথকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সাদা সামিয়ানার নীচে বস্তীঅঞ্চলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রভাতফেরির পর গান গাওয়াতেন—'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।' প্রিয়নাথও বাবার এই মন্ত্রে দীক্ষিত হতে শুরু করেছিল। রিফিউজি বলে সরকারী সাহায্য নেয়নি। এখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করে, কলেজে ঢুকে মন্ত্র নিয়েছিল সাম্যবাদের। বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধলেও আদর্শের পবিত্রতা রক্ষায় তারা দুজনেই ছিলেন এক। আর পঞ্চাশের দশক তো কিশোরদের কাছে আদর্শের জয়গান গাইত। সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল তারা, প্রিয়নাথও তাদের একজন। আদিনাথ বলতেন—মানুষ মরে না। নতুন করে সব কিছু গড়ে তুললে দুঃখ কিসের ? নিজের হাতে গড়া স্কুলে মাষ্টারি আর ক্বচিৎ এক আধটা ট্যুশনি—সংসার চলে যেত। প্রিয়নাথও আদর্শের স্বপ্নে নিজের কথা ভাবেনি।

প্রফুল্ল আদিনাথের আদর্শের দীপ্তিকে ভয় পেতো। মুখে সাহস পেত না বিরোধিতার। একদিন এসে বলল—দাদা, যাদবপুরে জমি দখল হচ্ছে, কলোনি হবে বাস্তুহারাদের। আমরাও বাস্তুহারা। তুমি শুধু মুখ ফুটে বল।

—কি জন্য প্রফুল্ল ?

—আমরা দু পরিবার একসঙ্গে পাশাপাশি চিরকাল থাকতে পারতাম।

—আমরা ? কেন ? আমাদের তো আশ্রয় আছে। ও জমি যাদের কিছুই নেই, তাদের জন্য।

—আমাদেরই বা কি আছে ? এটা তো বাসা, নিজেদের জমি-জমার দরকার নেই ?

—এটা অন্যায় প্রফুল্ল, অন্যের গ্রাসে মুখ দেয়ার মত। আমরা তবু অক্ষত ফিরে এসেছি, যাই হোক হয়ে যাবে। দুবেলা ডাল ভাত জোটাতে পারি। কিন্তু সবার কি তাই ? তাছাড়া, এই বাসা, এলাকা সবই কালে কালে আমাদের হয়ে যাবে।

প্রফুল্ল সেদিন কিছু বলেনি। আদিনাথকে আঘাত দিতে চায়নি। দুর্বলতা আছে, ভালবাসে তাকে, তবু প্রফুল্ল একদিন উঠে গেল অধিকৃত কলোনির জমিতে আর সেই থেকেই তার লক্ষ্মীর স্বর্ণপদ্মে পা রাখা। ঠিক হাউইবাজির মতো ভাগ্য ফুঁড়ে উঠতে শুরু করেছিল। শুরু করল ব্যবসা, কণ্ট্রাকটরি।

আদিনাথ জানত না প্রফুল্ল হুণ্ডি কেটে, পুটুলিতে লুকিয়ে কত টাকা, সোনা, সম্পত্তি এনেছিল ওপার থেকে। ক্রমে ক্রমে সুরঞ্জনকে বিয়ে দিল মস্ত বড়লোকের বাড়িতে, লিলির কলঙ্কিত ইতিহাস জেনেও। তারই পয়সায় ব্যবসায় আরও উন্নতি হয়েছে, ললিত-বাবুর সঙ্গে পার্টনারশিপ খুলেছে এবং কালে কালে কলোনির দোতলা বাড়ি বিক্রি করে বছর দশেক হল ভবানীপুরে বাড়ি কিনেছে।

প্রফুল্ল কিন্তু আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ সত্ত্বেও, পুরোনো সম্পর্ক নষ্ট করে নি। মনের কোথায় যেন স্ফীত ভাগ্যলক্ষ্মীর জন্য পাপবোধ বা দুর্বলতা ছিল। আদিনাথের সঙ্গে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতেই কথা বলত, দুঃখ পেত এদের সংসারের ছন্নছাড়া ভাব দেখে। মাঝে মাঝে আদিনাথকে বলত—ছেলেকে একেবারে হা ঘরে বিয়ে দিও না। খুঁটির মতো দু চারজন পয়সাওলা আত্মীয়স্বজন দরকার। আদিনাথ হেসে

বলতেন আমাকে তো চেনো প্রফুল্ল, ওকথা নাই বা তুললে। এমনকি বাষট্টিতে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পর প্রিয়নাথ যখন বাড়ির বাইরে বেরোতে পারত না, বলতে গেলে বেকার জীবন কাটাত, বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি নড়ে গেছল, প্রফুল্ল বলেছিল—মাস্টার, আমাদের ফ্যাক্টরিতে হিসেব রাখার কাজ করুক, সংসারটাতো চলবে।

আদিনাথ কোন কথাই মানেননি। শুধু শাখা-সিঁদুর পরিয়ে মঞ্জুকে ঘরে তুলেছিলেন আর প্রফুল্লদের ফ্যাক্টরির ব্যাপারে বলেছিলেন—যাস না, ও সব পয়সা সোজা পথে নয়। ব্যবসা মানেই তঞ্চকতা।

তবে প্রফুল্ল ঘুরিয়ে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিল বাড়িতে পড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে—মাষ্টার, আমার বিপদ! তুমি না দেখলে চলে না, ছেলেটাকে পড়াতে হবে তোমায়। এ প্রস্তাব কিন্তু আদিনাথ প্রত্যাখ্যান করেন নি। প্রফুল্লও কোনদিনই বুঝতে দেয়নি সাহায্যের ছদ্মনামে একটু বেশি টাকাই দিচ্ছে আদিনাথকে। সুবিমলের পর তাই প্রফুল্লর সংসারে তার নাতি প্রতীককে পড়াতে যায়। এটা অবশ্য সুরঞ্জনের অনুরোধ।

এই ভাবে তিন তিনটে দশক কলকাতার বুকে কেটে গেল। হঠাৎ রাতারাতি এলাকাটি উন্নতির ঘোড়া ছুটিয়ে এ্যারিস্ট্রোকেসির রাজপুত্রদের যখন হাজির করল, আদিনাথ বুঝতে পারছেন অদৃশ্য এক শক্তি সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের মত প্রতিনিয়ত জীবনের আবেগ, চিন্তা, বেঁচে থাকার স্বাভাবিক প্রবাহকে খণ্ড খণ্ড করে কোথায় নিয়ে চলেছে। নির্বাক দর্শক ছাড়া আদিনাথের মত বৃদ্ধের কিছু করার নেই।

৫

আজ তিন দিন পর প্রিয়নাথ দাস কেবিনে একটু বেলা করে হাজির হতেই, দাস হেসে বলে—তোমার সঙ্গে দরকার, আর তুমিই নাই প্রিয়দা? প্রিয়নাথ অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যে চশমাটা খুলে টেবিলে রাখতে রাখতে বলে—আমার সঙ্গে কোন শালার দরকার নাই? কলকাতার পুলিশ কমিশনার থেকে শীতল দাস—সবারই দরকার।

—তিনদিন কোথায় ছিলে?

—ভি. আই. পি মানুষ, খুঁজলেই আমায় পাওয়া যায়?

কবি তথাগত দূরের একটা টেবিলে শুকনো মুখে কাঁচুমাচু হয়ে বসেছিল। প্রিয়নাথ তাকাতেই ফিক্ করে হেসে ফেলে—প্রিয়দা, দরকার ছিল।

—দেখলে দাস, এই শালা ফেক্‌লু কবিরও দরকার আমার সঙ্গে। তথাগত এমন করুণভাবে হাসল জীবনে যেন বৃহত্তম বিপর্যয় ঘটে গেছে।

প্রিয়নাথের স্বভাবটাই এরকম। পারিবারিক কোন গভীর সংকট উপস্থিত হলে, বাইরের জগতে সে অনেক হাল্কা হয়ে যায়, ভাষা কথাবার্তায় কোন বাঁধ-বাঁধন থাকে না। দোকানে এখন ভীড় নেই, তথাগতকে এমন একটি কথা বলল, বেচারা লজ্জায় হাসতে থাকে। প্রিয়নাথের পারিবারিক সংকট ছিল খোকাকে নিয়ে। প্রিয়নাথ লক্ষ্য করছিল খোকা ইদানীং কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছিল। দাদুকে পাত্তা দিতে চায় না, মার উপর প্রায়ই ফুঁসে ওঠে, এমনকি প্রিয়নাথের উপস্থিতিতে সেদিন নতুন স্কুলের পোষাকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তিন দিন ধরে খোকাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। দু দিন সে স্কুলের নামে বেরিয়েও যায় নি সেখানে। কল্যাণী প্রতিদিন দেয়া-নেয়া করে, তাকে বারণ করে দিয়েছিল। হঠাৎ টুকাইর মুখে গোপন ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছল। পোষাক নিয়ে ছেলেরা যখন খ্যাপাচ্ছিল

মাস্টারমশাইয়ের কাছে নালিশ জানিয়েও যখন ফল পায়নি, ছুটির পর স্কুল কম্পাউণ্ডে একটি ছেলের সঙ্গে হাতাহাতি করে তার দামী ইলেকট্রনিক ঘড়িটা ভেঙে ফেলেছিল খোকা। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে ফিরে যেতে, খোকা দারুণ ভয় পেয়ে গেছল। ক্লাসের দু চারটে ছেলে শাসাল, পাড়ার মস্তান দিয়ে খোকাকে মায়ের ভোগে পাঠাবে। খোকা বাড়িতে কিছু প্রকাশ করেনি, কল্যাণীর সঙ্গে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নস্যাৎ করে, নিজেই বেরিয়ে ফিরেছে বিকেলে। লেকের ছায়ায়, ঝোপ-ঝাড় এবং রেল লাইনের ধারে কতগুলো অল্পবয়স্ক ঠিকানা-বিহীন ছেলেছোকরাদের সঙ্গে ঘুরে ঠিক সময় মত বাড়ি ফিরত। অবশেষে সামনের বাড়ির টুকাই মঞ্জুর কাছে ফাঁস করে দিতে প্রিয়নাথ গুম হয়ে গেছল। যার ঘড়ি ভেঙেছিল, তাদের বাড়ি গেছল প্রিয়নাথ। ভদ্রলোক ইনকাম ট্যাকসের মস্ত বড় অফিসার। উনি দেখা করেননি, বড় ছেলের কাছে প্রিয়নাথ ক্ষমা চেয়েছিল। প্রিয়নাথের চাইতে অনেক ছোট সে, প্রায় হাঁটুর বয়সী, তবুও তাকে বলতে হয়েছিল—ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি, ভবিষ্যতে এমন ঘটবে না। আপনারা স্কুলে প্রেসার দেবেন না, আমার ছেলের পক্ষে ক্লাস করা মুশকিল হবে। বুঝতেই পারছেন, এ বয়েসটা খুব মারাত্মক, তার উপর আমার ছেলে একটু সেন্টিমেণ্টাল।

—আপনি কি ঘড়িটা রিপ্লেস করতে চান ?

—পারলে ভালো হতো! যদি অলটারনেট না থাকে রাজি হতেই হয় আমায়।

ছেলেটা বাইরে দরজায় ভর দিয়ে কথা বলছিল, বসতেও বলেনি প্রিয়নাথকে। ভুরু জোড়া টান টান করে কেঠো হাসিতে জবাব দিয়েছিল—ঘড়িটা যার ভাঙল তার সেন্টিমেণ্টটা? দেখুন, স্কুলের ব্যাপার স্কুলের অথরিটি ভালো বুঝবে, আমাদের এ ডিসকাসন ইউজলেস, তাই নয় কি ?

—ধরুন, যদি ইনস্টলমেণ্টে রিপ্লেস্ করি? আপনাদের ক্যাশ-মেমো থাকলে……

ছেলেটি অদ্ভুত হাসিতে উত্তর দিয়েছিল—ওটা আমার দিদির বার্থ-ডে প্রেজেণ্টেশন। আপনি ভুল করছেন, নইলে অমন দু চারটে ঘড়ির জন্য……! কিছু মনে করবেন না, আপনার ছেলে হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি অন্য কেউ হলে প্যাঁদিয়ে খাল খিচে দিত!'

প্রিয়নাথ ফিরে এসেছিল আহত অভিমানে। খোকাকে কিছু বলেনি। পরদিন দুপুরের দিকে লেক, রেললাইন তন্ন তন্ন করে লক্ষ্য করেছে কোন ধরণের কিশোর নির্জন-অবসরে ওখানে হাজির হয়। প্রথম অবস্থায় প্রিয়নাথের ঝোঁক এসেছিল ছেলেকে একটু শিক্ষা দেয়া দরকার অর্থাৎ দৈহিক পীড়নের প্রয়োজন। এ মানসিক অবস্থা কিন্তু বেশি সময় ধরে রাখতে পারে নি, অদ্ভুত ভাবনায় মনটা ভরে উঠেছিল। এই কয়েক বছরে কেমন পাল্টে গেল! এক বিরাট অসমতা এসে গেছে কিশোরদের জীবনে। তাদের সময়েও মেলা-মেশায় কত স্বাভাবিকতা ছিল! ঐ তো বস্তীর শীতল দাস! তার সঙ্গে বন্ধুত্বও ছিল প্রিয়নাথের। এখন কিন্তু বাঘবন্দী খেলার মতো খোকাদের অবস্থা। না পারবে সামনের বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে স্বাভাবিক হতে, আবার বস্তীর ছেলেদের সঙ্গে পাঠিয়েও পিতৃহৃদয় নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। শীতলদের কালের বস্তী আর নেই। স্বাতন্ত্র্য ছিল তখন দারিদ্রের সহোদর হিসেবে। এখন বস্তীর পরিবেশ শিকার হয়েছে সংকীর্ণ রাজনীতি এবং কুকর্মের নির্ভয় স্থল হিসেবে। এ পরিবর্তন বছর পাঁচেকের। প্রিয়নাথ খোকাকে কিছু বলেনি, শুধু লক্ষ্য রাখছে, আর বিষণ্ণ চিন্তিত হয়ে পড়ছে।

দাস উঠে এসে বলে—আমার দোকানে তো ভাঙ্গার নোটিশ পড়ছে! ঘুম নাই তিনদিন!

—সবারই পড়ছে, তোমার একার? দুঃখ কিসের?

—হ, তুমি তো বলবাই! তুমি সব কথা হালকা কইরা ধর!

—আহা, কি মুশকিল! সবটা ভাঙ্গবে কি? খুলে কাশো তো?

দাস মিইয়ে যায় এবার। বিড়ির টানে চোখটা ছোট করে বলে—

বাকি আর থাকল কি? শুনতাছি ফার্নরোডেরে সোজা যোগ করব এইখান দিয়া।

—সে আমিও জানি। তোমার ঐ মোগলাই বানানো ঘরখানা ভাঙ্গা পড়বে। খুব ভাল, পচা ডিম আর ডিজেল তেল দিয়া লোকের তো পকেট কাটছ! যাও ধরো গিয়া, যারা তোমার মোগলাই খায়।

—তুমি খাওনা?

—মাপ কর। এই অ্যাণ্টাসিড আছে! আর তোমার তো শালা একখানা হাত কাটবে, দেহটাতো রইল, আমাকে যে পুরো কেটে ফেলতে চাইছে!

শীতল চুপ করে থাকে। তথাগত উদাস গলায় জিজ্ঞেস করে—কিসের প্রিয়দা?

—বাড়িওলাতো উকিলের নোটিশ থেকে মামলা রুজু—সবই হুমকি দিচ্ছে!

দাস বলে—এখন ঐ জায়গার কাঠা কত বলতো?

—উঠতে হবে আপনাকে? তথাগত জিজ্ঞেস করে।

—পাগল! দেখি মামলায় কত রস আছে! উঠে যাবো কোথায়? কলকাতা তিলোত্তমা, আমাদের মত মানুষ ঠিকানা ছুট হয়ে গেলে, আর কোথাও জুটবে না কিছু। যা জুটবে, তা নেয়ার ক্ষমতা নেই। চায়ে চুমুক দিয়ে, সিগেরেটের পাইপটা ঈষৎ টেনে নিজেই সগর্বে প্রিয়নাথ বলে—তিরিশ টাকায় বালিগঞ্জের বাড়ি! ভাবতে পারিস শীতল?

—হ, আইজ মনে হয়। সেই দিন? শালা···! শীতল দাস পুরোনো একটা ঘটনা স্মরণ করিয়ে দাঁত বার করে হাসে।

দোকানে খদ্দের আসে, দাস ব্যস্ত হয়। কিংবা কেউ বেরিয়ে গেলেও তাকে ছুটে এসে পয়সার হিসেব নিতে হয়। জমিয়ে প্রিয়নাথের পাশে বসতে পারছে না, দোকান ভাঙ্গার ব্যাপার নিয়ে পরামর্শ চাইতেও পারছে না।

—পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে। চইলা যাবার আগে মনে করিও!

দোকানের সামনে দিয়ে অনর্গল মানুষের যাতায়াত, রাস্তা দিয়ে ডাবল ডেকার, মোটর, মিনি। বেলা সাড়ে দশ এগারোটায় গড়িয়া-হাট অঞ্চল জমজমাট। মাঝে মাঝে দু চারটে গাড়ি বা মোটর সাইকেল এমন ভয়ানক উৎকট শব্দ ছড়াতে ছড়াতে যায়, দোকানের খদ্দেরদের কানে লাগে। শীতল দাসের সহ্য হয়ে গেছে, এবং সহ্য করেই কানের ক্ষমতা খাটো হয়ে গেছে তার।

সামনের টেবিলটা ফাঁকা হয়ে গেল। একটা চা এবং ভেজিটেবল চপ নিয়ে দীর্ঘ সময় মাঝবয়সী ভদ্রলোকটি সময় কাটাচ্ছিল। কাপে চুক্ চুক্ চুমুক দেয়, টেবিলে কনুই ভর দিয়ে তাকিয়ে থাকে, চামচ দিয়ে একটু একটু ভেঙ্গে চপ খায়। ধীর লয়ে সিগেরেট টানে। যে খদ্দেরই ঢোকে তেরচাভাবে তাকিয়ে দেখে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট, এক ঘণ্টা সময় নিল সে টেবিলটায়। মাঝে আর একটা চায়ের অর্ডার দিয়েছিল। এককালে নিঃশব্দে কাউণ্টারে বিল মিটিয়ে বেরিয়ে যেতেই তথাগত ঘন হয়ে বসে। ফিস ফিস করে বলে—লোক আর কমে না। কখন থেকে ভাবছি আপনার একটা পরামর্শ দরকার। প্রিয়নাথ শীতলের দিকে তাকিয়ে বলে—চেনো একে দাস? এই মাত্র পয়সা দিয়ে গেল যে? আমাদের সামনের টেবিলে ছিল?

—মুখ চিনি। এ সময়ে প্রায়ই আসে।

—শালা, স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক!

শীতল বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

—খোচোর? এইখানে মরতে আসে কেন?

—খবর রাখ? এই এলাকা থেকে গত দু মাসে একটা ট্যাক্সি, তিনটে প্রাইভেট চুরি গেছে। মনে হয় একটা গ্যাং অপারেট করছে এলাকায়। আর তোমার দোকানখানা তো বিখ্যাত।

শীতল হেসে বলে—তীর্থক্ষেত্র! এককালে, প্রিয়দা তোমার মনে আছে? শালা তোমাগো লগে খোচোরগো লুকাচুরি চলত?

কিন্তু এখন তো জমানা পাল্টাইছে, ভাবলাম মুক্তি! শালা সেই মার্কামারা রইয়া গেলাম।

সেই উনষাট ছেষট্টি, সত্তর বাহাত্তরে শীতল বুঝতে পারত কারা প্রকৃত খদ্দের, খদ্দেরের ছদ্মবেশী কারা। প্রিয়নাথকে রাত এগারোটার পর খবর দিত, অমুক শালায় এসেছিল। সত্যিই লুকোচুরি খেলা! কিন্তু বছর চার পাঁচ শীতলের ওসব ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ নেই। কেমন ঢিলেঢালা ভাবে দোকান করে। আর তেয়াত্তরে ছোট ভাই বিমল উগ্র মতবাদের জন্য খুন হয়ে যাওয়ার পর এ সব ব্যাপারে নিস্পৃহ। খরচের খাতায় ধরেই রেখেছিল, কত দিন প্রিয়নাথ বলেছিল অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না। কিন্তু তখন কোন ব্যাপারে কারও হাত নেই শুধু ব্যথাতুর নীরব দর্শক হওয়া ছাড়া। বিমল যে সে রাতে বাড়ি ফিরবে, শীতলও জানত না। সেদিন ছিল বিমলের ছেলেটার জন্মদিন। শেষরাতে পুলিশের ঘের, বস্তীর শেষ প্রান্তে গুলি করা এবং তা নিয়ে বেশ কিছু দিন উত্তেজনা ছিল এলাকায়।

তথাগত খানিক চুপ করে রইল স্পেশাল ব্রাঞ্চের নাম শুনে। কবি মানুষ, মুখে বা কলমে যতই বেপরোয়া ভাব দেখাক, বাস্তবে ঠিক উল্টো। প্রিয়নাথ আশ্বস্ত করে বলে—তুমি তো আর কার-লিফট কর না। চিন্তা কিসের? কলকাতার সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালে চলে? বল, কি বলছিলে। কাঁচু-মাচু হয়ে আছ কেন? তথাগত ম্লান হাসি দেয়।

—দু রাত ঘুমুচ্ছি না।

—কবিতা লিখছ? না বিপ্লব?

তথাগত মাথাটা হেলিয়ে প্রিয়নাথের কানের কাছে টুক টুক করে কি যেন বলে যায়। হয়ত এমন কথা যা তিনকান হবার মত নয়। প্রিয়নাথ শুনছিল, ভুরুতে ভাঁজ পড়ছিল, চোখ ছোট করে সিগেরেট টানছিল আস্তে আস্তে। তথাগতকে নিয়ে যতই রস-রসিকতা করুক, মনের কোণায় ভালোবাসা আছে। এককালে ভালোই কবিতা লিখত তথাগত, প্রিয়নাথ বাষট্টির আগে যে দলীয় দৈনিকটিতে কাজ

করত, রবিবাসরীয়তে বেশ কয়েকটা কবিতা ছাপিয়ে দিয়েছিল। তখন তথাগত কলেজের ছাত্র, থাকত গ্রামে। সেই থেকেই প্রিয়নাথের সঙ্গে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা। তথাগতর স্ত্রী সুন্দরী। গ্রামের পাট চুকিয়ে কলকাতায় থাকে স্বামী-স্ত্রী। নামী-দামী কবি হবার বাসনায় তথাগত বিভিন্ন মহলে ঘুরছে, বড় বড় পত্রিকার কর্তাদের সঙ্গে কফি-হাউস, হোটেল, এম্‌ব্যাসিতে যাচ্ছে। কবি সম্মেলন চলছে। বাপের কিছু পয়সাও ছিল তথাগতর, তাল মেলাতে কিছু অসুবিধে হত না। এবং স্ত্রীকেও সে সঙ্গে নিয়ে কাব্য-চর্চার বিজয়-অভিযানে বের হতো। তারপর কোন এক সুপ্রভাতে টের পেল বৌ পালিয়েছে এমন এক-জনের সঙ্গে, অর্থে-ক্ষমতায় তার একগাছা কেশস্পর্শ করতে পারবে না তথাগত। এই দাস কেবিনেই প্রিয়দার কাছে কান্নাকাটি। কিন্তু কি হবে? তারপর তথাগত মদ্যপানে নিয়মিত আসক্ত হয়ে ওঠে। ডিভোর্সের মামলা রুজু হয় এবং তথাগত শেষ চেষ্টা করে ছেলেটিকে তার সঙ্গে রাখতে পেরেছিল। যাই হোক, ছেলেটাই তাব শান্তির-নীড। এখন সেই ছেলেটিকে গত পরশু জোর করে মামারা নিয়ে গেছে। হয়ত ফিরিয়ে দেবে না।

প্রথম ধাক্কায় প্রিয়নাথ তথাগতকে একপশলা অশ্লীল বাক্যে ভূষিত করল এই প্রকাশ্য দাশ কেবিনেই। বোঝা যায় প্রিয়নাথ তথাগতকে ভালোবাসে, খুবই দুঃখ পেয়েছে তার এই বিপর্যয়ে। কিন্তু জেনেশুনে আগুনে আঙ্গুল পোড়ালে কার কি করার থাকতে পারে।

—আজ আর হা হুতাশ করে লাভ? শালা এ্যামবেসির মদ খেয়ে ভাবলে বড় অঁাতেল হয়ে গেছো! সার্ত্রে, কামুর ঘরের লোক!

তথাগত কাঁচু-মাচু হয়ে বলে—প্রিয়দা, আমি কিন্তু সোসালিষ্ট দেশের এমব্যাসিতেই যেতাম।

—শালা। সোসালিষ্ট মদটা কি আলাদা? রাত দুটো আড়াই টেয় বাড়ি, দশটায় ঘুম থেকে ওঠা, সবই সোসালিষ্ট? সব্বনাশ করেছিস, তথাগত।

—তাই বলে, আইনের জোরে ছেলেটা আমার, তাকে নিয়ে যাবে? সে এবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, নিয়ে যাবে। পারলে আইন দিয়ে আইনকে বাঁচা। অত সোজা নয়!

—এতো কিড ন্যাপিং, জুলুম!

—শালা, আজ চেঁচাচ্ছ? বউ দেখিয়ে নাম করতে গেছলে, আঁতেল হতে গেছলে, তোমার নাই বংশের জোর, পয়সার মুরোদ, খাল কেটে কুমীর ঢোকাবার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে? আজ ছেলেকে তারা নেবেই; ঐ সোস্যালিষ্ট কিড ন্যাপিং! শালা! মদ, মাগী, বার, রেষ্টুরেন্ট তার আবার সোসালিস্ট-ক্যাপিটালিস্ট কিরে? তথাগত কোন জবাব দিতে পারল না। টেবিলে দুই কনুই ভর দিযে, দু হাতের মধ্যে গালদুটো রেখে তাকিয়ে রইল সামনে। প্রিয়নাথ লক্ষ্য করল চোখের কোণাদুটো তথাগতর ভিজে চকচক করছে। প্রিয়নাথ নিজেই দুটো চায়ের অর্ডার দিল। তথাগতর ফর্সা ছোট্ট ফুলো গাল, কোঁকড়া ব্যাক্ব্রাশ করা ঘন চুল। ছোট্ট কপালটি ঘামিয়ে উঠতেই মণিবন্ধে বোতাম-আঁটা টেরিকটের পাঞ্জাবীটার পকেট থেকেই রুমাল বার করে মুছল এবং একটা সিগেরেট ধরাল।

—আমাদের ট্র্যাজেডিই এখানে। পরিস্থিতিটাই এমন, যে কোন সময়ে দেশবিভাগের মত সম্পর্ক, পরিবার ভাগ হতে পারে, তার ওপর তুমি নিজেই সুতো ছেড়েছিলে। প্রিয়নাথ শান্ত গলায় বোঝায়।

—আপনিতো সব জানেন প্রিয়দা।

—জানি বলেই বলছি। বুঝলে ভায়া ও ভাবে হয় না, আমার সঙ্গে চারপাশের আকাশ-পাতাল পার্থক্য, আমি অক্ষত টিকে রইলাম, তা হয় না। তা বন্ধুত্বই হোক, পরিবেশ, এলাকা, আত্মীয় যাই হোক না কেন। তখনই বারণ করেছিলাম তুমি ডেঞ্জারাস পথে যাচ্ছো, পস্তাবে।

—ও গেছে আমার কোন দুঃখ নেই। শালা মেয়েরা তো চির-

কালের বিট্রেয়ার, কিন্তু ছেলেটাকে জোর করে নিল কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ?

—মেয়েরাই চিরকালের বিট্রেয়ার ? সোস্যালিজম না বুঝে সোসালিষ্ট মদ খেয়েছ বলেই তোমার এই চিন্তা। যাক্ আইন দিয়ে সব কিছু হয় না। টোপ দিয়ে মাছ বাঁধাতে পার কিন্তু ছিপ-সুতো শক্ত না হলে পালাবেই। আইনও তাই। তোমার অনুকূলের রায়, ক্ষমতা, অর্থ না থাকলে ধরে রাখা যায় না। এইত, আমার বাড়িওলা মামলা করেছে, উঠে যেতে হবে। উনি বেচবেন লক্ষ টাকায়। আইনে আমাকে তোলা মুসকিল কিন্তু ঐ দোতলা-তেতলার এ্যাটাকে আমি নিজেই যে চেপে মরে যাচ্ছি, উঠে যেতে হবেই আমায়। ঐ যে বললাম দেশ বিভাগের মত, আমাদেরও······

রুমাল দিয়ে চোখের কোণা দুটো মুছে তথাগত শান্ত হয়ে বসল। শীতল কাউন্টারে বসে দাঁত খুটছিল। পানের কুচিটা বড্ড বিরক্ত করছে। আড়চোখে তাকিয়ে ভাবছিল প্রিয়নাথের কথা। কত লোক কত সমস্যা নিয়ে আসে ওর কাছে! অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মানুষটার। মানুষ বুঝে কথা বলতে পারে। রাজনীতি হোক, সাহিত্য, ব্যবসা, অধ্যাত্মবাদ কিছুতেই প্রিয়নাথের পেছপা নেই।

একে একে আরও দু চার জন টেবিলে জড় হয়। কেউ হয়তো কাউন্টারেই জিজ্ঞেস করে—প্রিয়দা আছে ? পরিচিত হলে শীতল হেসে বলে—দাস কেবিনটা তো প্রিয়দারই, থাকবে না ? লোকটি হাসতে হাসতে প্রিয়নাথের টেবিলে খবরের কাগজটা ফেলে বলে— দেখেছেন, আফগানিস্থান সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধীর নতুন স্টেটমেণ্ট ? প্রিয়নাথ মুখ তুলে বলে—চায়ের অর্ডার দিয়ে রাজনীতি করবে। শুকনো মুখে কিছু হয় না।

—বলে দিচ্ছি, দাসবাবু চারটে ডবল হাফ।

—হ্যাঁ, বোসো এবার। প্রিয়নাথ কাটা সিগেরেটের টুকরো পাইপে ভরে কাঠি জ্বালায় এবং নতুন দেশলাইটার দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ বলে ওঠে—দেশলাইটা রাখলাম, এটা পাইনি।

—সেজন্যই এনেছি।

দেশলাই-বাক্স জমানো প্রিয়নাথের অভ্যেস। নতুন ছবি হলেই কেটে রেখে দেয়। ইচ্ছে আছে একদিন প্রদর্শনী করবে। ফলে যে যেখানেই নতুন ছবির দেশলাই কেনে, তুলে দেয় প্রিয়নাথের হাতে।

বেলা সাড়ে বারোটা-একটা পর্যন্ত আড্ডা চলে। দাসের দোকানের ছেলেরা একে একে চেয়ার গুছোতে শুরু করলে, দাস আধখানা ঝাঁপ টেনে নামায়, রাস্তায় মধ্যাহ্নের পরিবেশ নেমে আসে, ওরা সদলবলে ওঠে তখন। আজ বেরোতে গিয়েই দাস বলল—তোমার সঙ্গে কথা ছিল যে ?

—রাতে আসব।

খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম না করলে সে কাজে বেরোতে পারে না। অম্বল আর গ্যাস বড় কাহিল করে তাকে। এলমাকাবেও কাজ দেয় না তখন। গলির মোড়ে ঢুকতে এ্যাডভোকেট-বাড়ি থেকে ঝি সুরমাকে বেরোতে দেখে প্রিয়নাথ জিজ্ঞেস করল—কি গো বুড়ির মা, পাত্তা নেই কেন ? দু দিন এলে, তারপর ?

সুরমা ধানাই-পানাই করে।

—যাব কি দাদাবাবু, মেয়েটার শরীর ভাল নেই, আমিও সময় পাই না, তোমরা নতুন লোক দেখ !

—একটা জুটিয়ে দাও তাহলে ! অমন দুট্ করে ছাড়লে চলে ?

—জোটাবো কি দাদাবাবু, নোক পাওয়া যায় না। অনেককে তো বলেছি !

প্রিয়নাথ হেসে বলে—রেলের বস্তীর সবাই তো তোমরা কাজ কর বাপু ! লোক খুঁজে পাচ্ছ না ?

সুরমা বলে—পাব না কেন, সে টাকা তোমরা দিতে পারবেনি। সুরমার গলায় কেমন যে দীর্ঘ লয়ের টান ফুটে ওঠে। এ্যাডভোকেট-বাড়ির এক মহিলা জানালা থেকে বলল—ও বউ, রাস্তায় দাঁড়ালে আর কথা শেষ করতে চাও না ! কখন থেকে তোমায় ডাকছি। প্রিয়নাথের পৌরুষে বাঁধল। কথা তো তার সঙ্গেই বলছিল সুরমা।

এই তো দুই তিন বাড়ির শেষেই প্রিয়নাথের বাসা। সে কি রাস্তার লোক? আর সুরমারও আস্পর্ধা, বলে কিনা 'সে টাকা তোমরা দিতে পারবেনি?' সত্যি তত্ত্ব আর বাস্তব আকাশ পাতাল ফারাক। সাধারণ মানুষ বলে চেঁচাই বটে, এগুলোর ব্যাখ্যা কি হবে? এ্যাড-ভোকেট-বাড়ির মহিলাটিকে শুনিয়ে শুনিয়ে যেন বলতে চাইল—শোন সুরমা, মঞ্জুর সঙ্গে কথা বলে আসবে। এক বার জানিয়ে আসবে তো? আমরা কি লোক রাখতে পারি না পারি, সব তুমি বুঝে ফেলেছ? প্রিয়নাথ বাসায় ফিরে আসে, সুরমার ব্যবহারে একটু খোঁচা লাগে যেন।

খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করে কাজে বেরোবার আগে, আদিনাথ বললেন—আজ ফেরার পথে এডলফিন্ ট্যাবলেটটা আনতে পারবে? সকালে প্রেসার ছিল একশ আশি! তোমার মা'রও মনে হয় প্রেসারটা বেড়েছে। সারাদিনই শুয়ে আছে। প্রিয়নাথ বলল—চেষ্টা করব। তরপর বেরিয়ে আসে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলা। পাশের ঘরটায় টেলিপ্রিণ্টার মেশিনটায় ঠক্ ঠকা ঠক্ বেজেই চলে, উগরে দেয় সংবাদ। তারপরই ছোট্ট একটি বারান্দা পেরোলেই প্রিয়নাথের ঘর। কাগজের মালিক ভূধরবাবু প্রিয়নাথের জন্যই ঘরখানা সাজিয়েগুছিয়ে দিয়েছে। কলকাতার বুকে এ দৈনিকটার অস্তিত্ব দীর্ঘদিনের, তবুও এর শ্রীবৃদ্ধি, উত্থান-পতন নেই। কত দলের সরকার এল গেল, ভূধরবাবু কাগজটার ভাগ্য ফেরাতে মোটেই আগ্রহী নন। মাঝে মাঝে রাইটার্স বিল্ডিং যান, দিল্লীতেও বিশেষ লবিতে তার দহরম মহরম। ফলে দৈনিকটির মুদ্রণসংখ্যা যাই হোক না কেন, সরকারী-বেসরকারী বিজ্ঞাপনের কোনদিন অভাব হয় না। নিউজ প্রিণ্টের সরকারী কোটাও আছে, কালোবাজারে মোটা অংশ তিনি বিক্রী করে দেন। স্টাফদের মায়না ওয়েজবোর্ড অনুযায়ী দেন না। এ সব ব্যাপার কলকাতার সব মহলই জানে, বিশেষ করে যারা সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত। তবুও সাংবাদিক, ফিচার-লিখিয়ে বা প্রেসের কর্মীদের কোনদিন

অভাব হয় না। কেউ হাত পাকাতে আসে, কেউ নিরাশ্রয় বলে ঘাড় মাথা গুঁজে কাজ করেই যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রিয়নাথকে একটু অধিক বেতনের লোভ দেখিয়েই মালিক ভূধরবাবু ডেকে এনেছেন। প্রিয়নাথের রাজনৈতিক মতামত যাই থাকুক না কেন, কাজ জানে সে। ভূধর বাবুর ইচ্ছে কাগজটিকে নতুন করে সাজাবেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে বাজার সৃষ্টি করতে চান তিনি।

বেয়ারা খবর দিয়ে গেল মালিক তলব করেছে প্রিয়নাথকে। প্রিয়নাথ তখন পাশের টেবিলের তরুণ দেবব্রতকে রবিবাসরীয় কি ভাবে সাজানো যায় বোঝাচ্ছিল। দেবব্রত এম এ ক্লাসের ছাত্র। অস্থায়ী ভাবে এই পত্রিকায় সাংবাদিকতার হাতেখড়ি নিচ্ছে। এতদিন রবিবারের কাজটা ছিল মামুলি—দায়সারা গোছের। দেবব্রতকে প্রিয়নাথ হাতে ধরে শেখাচ্ছিল কি করে নতুন নতুন বিতর্কিত বিষয় দিয়ে কাগজটিকে সুখপাঠ্য করা যায়। ভূধরবাবুর তলব পেয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে পথে শঙ্করের সঙ্গে দেখা। শঙ্কর কম্পোজিং সেকসনের কর্মী। এমন প্রাণচঞ্চল, বুদ্ধিমান, কর্মঠ যুবক কলকাতায় সহসা চোখে পড়ে না। প্রিয়নাথ খুব ভালোবাসে তাকে। সাংবাদিক, লেখক, নিউজ-এডিটর থেকে শুরু করে প্রেসের প্রতিটি কর্মীর সঙ্গে প্রিয়নাথ বন্ধুর মতো মিশতে পারে। সবার কাছেই সে প্রিয়দা। শঙ্কর মুচকি হাসতেই প্রিয়নাথ বলল—যাবার আগে দেখা করে যেও, কথা আছে। শঙ্করের দেহে রংচটা ফুলপ্যান্ট এবং ছেঁড়া গেঞ্জি। গেঞ্জিটা প্রেসের কালিতে মলিন। —একটু আগে ছাড়বেন প্রিয়দা, আমার লাইনের গাড়ির গণ্ডগোল!

—সব তখন শুনব। প্রিয়দা দাঁড়ায় না। আস্তে হেঁটে ভূধর বাবুর ঘরে ঢুকতেই, উনি হেসে বললেন—প্রিয়নাথদা, ইণ্টারভিউ সামলান! বয়সে হয়তো ভূধরবাবু প্রিয়নাথের চেয়ে বছর তিনেকের বড়। মস্ত ভুঁড়ি, গাল গলা তেল-চকচকে। ঘিয়ে রংয়ের সিল্কের বুশশার্ট এবং টেরিকটের প্যাণ্ট। ভূধরের টেবিলের সামনে আরও দু চার জন যারা বসে আছে প্রিয়নাথ তাদের চেনে না! নানা লোক

নানা উদ্দেশ্যে এখানে আসে, ভূধরকে বিভিন্ন স্বার্থে অদ্ভুত ও সন্দেহজনক যোগাযোগ রাখতে হয়।

—ঐ যে গ্রামের করেস্পণ্ডেন্ট চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?

—সেতো বাইরে বাক্স ঝুলিয়েছি। লেখা জমা পড়বে, ছাপা হলে সে অনুযায়ী পেমেণ্ট!

ভূধরবাবু হাসেন।

—সে আর কে বোঝে? তখনই আপনাকে বলেছিলাম, নতুন নতুন জিনিষ চালু করছেন, ঠ্যালা সামলাতে পারবেন? আপনি শুনলেন না। প্রিয়নাথ জবাব দিতে যাচ্ছিল, বাইরের লোক দেখে চুপ করে গেল। খানিক ভেবে বলল—পরিকল্পনাটা ভালো, গ্রামের খবর যত বেশি দেব, আমাদের কাগজের সার্কুলেসন তত বাড়বে।

—তা বাড়বে, কিন্তু আপনাকে আর কি বলব, আচ্ছা যান ওদের সামলান তো আগে।

প্রিয়নাথ হাসে—প্ল্যানটায় অবশ্য আপনিও সায় দিয়েছিলেন।

—না, না, পরিকল্পনা ভালো।

প্রিয়নাথ বেরিয়ে যখন অন্য ঘরে এল, জন তিরিশ যুবক ও মধ্যবয়স্ক বসে আছে। প্রিয়নাথ ঢুকতেই সমবেত জুতোর ঘষঘষানি শোনা গেল। প্রিয়নাথ বলে—দাঁড়াতে হবে না, বসুন, বসুন!

মনে ভাবে হয়তো এরা তাকেই কাগজের মালিক ভেবে বসে আছে। ঘরের মানুষগুলোর জন্য করুণা হয়। বিরক্তি জন্মায় ভূধরবাবুর উপর। এ যেন টুকরো খাদ্যের প্রলোভন দেখিয়ে ক্ষুধার্তদের নিয়ে খেলা করা। ওরা অনেকেই হয়তো ভাবছে সংবাদপত্রের দরজা খুলে গেল ভাগ্যে। আজকাল সাংবাদিকদের কিছু সম্মান ও স্বচ্ছলতা বেড়েছে। ওয়েজ বোর্ড হয়েছে, নতুন কমিশন হবে, সুতরাং আর কি! শিক্ষার মান এদের সবারই গ্র্যাজুয়েট, কিছু এম. এ. আছে।

—আপনারা বিজ্ঞাপন দেখে এসেছেন সবাই? এতো স্বাভাবিক

ব্যাপার। প্রিয়নাথ মনে মনে খুশিও হয়। তাদের কাগজকে কলকাতার লোক মর্যাদা না দিলে কি হবে, গ্রাম ও মফস্বল অঞ্চলে নিশ্চয়ই প্রচার প্রসার আছে।

—সবাই নতুন? অন্য কোন কাগজের অভিজ্ঞতা আছে?

অন্য কাগজ বলতে শহরের কোন দৈনিকে নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয়। তা থাকলে এ ধাপ্পা তারা বুঝতে পারত। অনেকেই নানান গ্রামীন কাগজ, সাহিত্যপত্র, বুলেটিন, এমন কি সুভেনিয়র, যে যার পকেট, ঝোলা থেকে বার করে। বেশ কয়েকজন পঞ্চায়েত-মেম্বারের চিঠি, দলীয় নেতার এবং এম. এল. এর সার্টিফিকেট খুলে দেখাল। প্রিয়নাথ দেখতে চাইল না। দেখার আগ্রহ বোধ করল না সে। এক ভয়াবহ চিত্ররূপ ফুটে উঠতে থাকে।

—আপনারা ভুল বুঝেছেন, আমরা কিন্তু এ ভাবে ইণ্টারভিউ দিয়ে লোক চাই নি। আমাদের গ্রামের সংবাদদাতা দরকার। আপনারা যে যার এলাকা থেকে খবর লিখে পাঠাবেন, দরকার হলে নিজেদের হাতে দপ্তরে পৌঁছে দিয়ে যেতে পারেন। সংবাদ ছাপা হলে, আমাদের যা রেট, সে ভাবে পে করব।

—খবরটা কি সেভাবে ছাপা হয়েছিল? একজন মাঝবয়সী ক্রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করতেই, অনেকেই তাকে সমর্থন করে কাগজের কাটিং বার করে দেখায়।

—আপনারা ঠিকভাবে ভেঙ্গে বিজ্ঞাপন দেননি কেন?

—ওটা আমাদের ভুল। কিন্তু আপনারা জানেন কোন কাগজে এ ভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক নেয় না।

একজন জিজ্ঞেস করল—রিপোর্ট পাঠালেই কি ছাপাবেন? কি ধরণের খবর আপনারা চান?

—যে ধরণের খবর আমরা ছাপি। কাগজ তো পড়েন আমাদের।

প্রায় বিশ মিনিট বাক্‌বিতণ্ডা, মৃদু অনুযোগ, তোয়াজ, কৃপাভিক্ষার মধ্যে প্রিয়নাথ বুদ্ধিতে একে একে সবাইকে বিদায় দিয়ে, নিজের টেবিলে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়ল। একজন এ্যাসিটেণ্ট নিউজ-এডিটর

ব্রজেশবাবু বসেছিল প্রিয়নাথের অপেক্ষায়। দেবব্রত রবিবাসরীয়র জন্য একটা প্রবন্ধে চোখ বোলাচ্ছিল। প্রিয়নাথ সিগেরেটের টুকরো পাইপে ভরতে ভরতে বলে—ভূধরবাবু একেবারে জোচ্চোর! মানুষকে এমন বিপদে ফেলে! ইন্টারভিউর ছেলেখেলা। বলেছিলাম ওভাবে বিজ্ঞাপন দেবেন না, এখন উল্টে বলছেন আমার পরিকল্পনা ভুল।

—একগাদাকে ঠেকালেন? ব্রজেশবাবু পান চিবোতে চিবোতে বলে।

—ঠেকালেন মানে? কত এম. এল. এ আর পঞ্চায়েতের সার্টিফিকেট দেখতে হয়েছে জানেন? আমাদের দেশটাও হয়েছে গাঁড়লের আখড়া! দেখেছে খবরের কাগজ, মাছির মত ছুটে এসেছে!

ব্রজেশবাবু ফুক ফুক্ বিড়ি টেনে বলে—পনেরো বছর তো দেখছি প্রিয়দা! মালিক চান বিনেপয়সায় কাগজ ভরাতে। আমি তো তখনি ভেবেছি, বিপদে পড়বেন আপনি!

—প্ল্যানটা যখন দিলাম, উনি সায় দিলেন। বললাম কিছু কিছু ছেলেছোকরাকে কনট্র্যাকট অনুসারে গ্রামগঞ্জে পাঠিয়ে খবর আনান, গ্রামবাংলার খবরের গুরুত্ব দিই, দেখবেন কাগজের খদ্দের বাড়বে, সার, সেচ, কৃষি বিভাগের বিজ্ঞাপনও আসবে। সবকিছু ফ্রিতে পেতে চান, ওভাবে লোক নেবেন না।

—কি ভাবে নিতে চাচ্ছেন?

—ছেলেগুলোকে বড় বড় কথা বলে সাংবাদিক বানিয়ে দেব। গদগদ হয়ে ফিরে গিয়েই খবর পাঠাবে, ছাপালে টাকা। আরে ছাপাবে ঠিকই, টাকার বেলা ঢু ঢু! কিন্তু এমনভাবে বিজ্ঞাপন দিলেন, যেন সত্যিই আমাদের কাগজ বেশ কিছু রিপোর্টার রিক্রুট করছে।

ব্রজেশবাবু হাসতে হাসতে বলে—যাক্! বলুন মহাজাতি সদনে ছাত্র পরিষদের বৈঠকটার খবর ফার্স্ট পেজে যাবে?

—এডিট করেছেন? কই কপি দেখি?

চা এলো। চায়ে চুমুক না দিলে সংবাদপত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বা লেখা হয় না। ভাঁড়ে চা চলছে ঠিক তখনই শঙ্কর

এলো। প্রিয়নাথ অবাক হয়ে বলে—ক'টা বাজে, এখনই হাত পা ধুয়েছ যে ? শঙ্কর হেসে বলে—আগেই বলেছি, সকাল সকাল বেরোব।

—কেন ? বাঁধা ঘর বানিয়েছ কলকাতায় ?

—কি যে বলেন প্রিয়দা ! যা পয়সা দেন পেটই চলে না। সকালে স্টেশনে শুনলাম ওভার-হেডের গণ্ডগোলের জন্য ট্রেন ধামুয়া পর্যন্তও যাচ্ছে না। যদি না যায়, ধামুয়া থেকে হেঁটে বা বাসে যেতে হবে। রাত করব না আজ।

—সত্যি, তোমাদের কথা ভাবলে ···

—তবু কলকাতা থেকে ভালো আছি। কষ্ট করে একবার বাড়িতে পৌঁছলেই ব্যাস্ শান্তি ! এখানের মতো দমবন্ধ অবস্থা নয়। গুড়টা কেমন ছিল সেদিন ?

—খুব ভালো। বাবা বললেন, দেশের বাড়ি ছেড়ে এসে অমন গুড় আর খাননি।

গ্রামের বাড়ি থেকে শঙ্কর মাঝে মাঝে প্রিয়নাথের জন্য সস্তার তরকারী, গুড়, ডিম এনে দেয় ! ভালো কিছু পেলেই প্রিয়নাথদার কথা মনে পড়ে তার। গতবছর খুব সস্তায় টাটকা ইলিশমাছ খাইয়েছিল দু দিন। শংকরের মধ্যে এখনও যে মূল্যবোধ আছে, কলকাতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্রজেশবাবু উঠে চলে যেতেই প্রিয়নাথ সরে এসে আড়ালে শংকরকে জিজ্ঞেস করল—তোমাদের ওখানে বাসা ভাড়া পাওয়া যায় ?

—যাবে না কেন, কার জন্য ?

—ধরো আমিই যদি নেই ?

—যাঃ ! শঙ্কর বিশ্বাসই করতে চায় না। কলকাতার মোক্ষম জায়গায় যে আছে, হুট করে ডায়মণ্ডহাবরায় যাবে ?

—আপনাদের বাসার অভাব ? ডায়মণ্ডহারবার মরতে যাবেন কেন ?

—বাসাটা পালটাবো ভাবছি। অবশ্য সরকারী ফ্ল্যাটের জন্য দরখাস্ত করেছি, হয়েও যাবে বোধ হয়।

—তাহলে আর খুঁজছেন কেন?

—ব্যাপার হলো একটু জমিজিরেত না থাকলে খোলামেলা বাস করা যায় না।

—কিন্তু কলকাতার মানুষদের ট্রেন-জার্নি পোষাবে না। আপনি গেলেতো খুবই ভালো, বাসা ঠিক করে দেয়া এমনকিছু কষ্ট নয়। আজকাল সরকারী ফ্ল্যাট নাকি খবরের কাগজের লোকেরা তাড়াতাড়ি পায় শুনেছি?

—হ্যাঁ।

শঙ্করকে ডেকে প্রথম প্রস্তাবটা দিয়েই প্রিয়নাথের খট্ করে কেমন বোধ হতে পিছিয়ে এল। ঝোঁকের মাথায় শঙ্করকে ডেকে বাসার কথা বলে ফেলে, কলকাতায় দীর্ঘদিনের জীবনধারায় স্বাতন্ত্র্যবোধ মাথাচাড়া দিতেই, সে সরকারী ফ্ল্যাটের কথা তোলে এবং শংকরের বাসা খোঁজার প্রতি আর আগ্রহ দেখায় না। শংকরকে ভালোবাসে প্রিয়নাথ তবু মানুষের চরিত্র বড় জটিল! শংকর মুখে যাই বলুক প্রিয়নাথ তাদের বাড়ির সামনে উঠে গেলে খুশিই হয়!

টেলিফোন! দেবব্রত প্রিয়নাথকে ডেকে দিতেই টেবিলে এসে বসে। দরকারী কথাবার্তা সেরে মনে ভাবল ভূধরবাবুর সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করার দরকার, বাইরে অফিস চত্বরে গাড়িটা অপেক্ষা করছে, কোন ফাঁকে হয়ত বেরিয়ে পড়বেন! আজ কিছু টাকার দরকার প্রিয়নাথের। বাবা বলেছিলেন এডলফিন্ নিয়ে যেতে। মার শরীরটাও ভালো নয়। দেবব্রতকে খানিক দেখতে বলে সোজা ভূধরবাবুর ঘরে চলে এলো। আমাত্য নিয়ে উনি সত্যিই উঠে পড়তে ব্যস্ত, হঠাৎ প্রিয়নাথকে ঢুকতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। একটু আড়ালে ডেকে প্রিয়নাথ বলে—বেরোচ্ছেন তো, আমার কিছু টাকার দরকার! তিলকবাবুকে বলে দিন!

—বললে কি হবে, তিলকবাবুর হাতে কিছু নেই। যাত্রার বিজ্ঞাপন ছুটোর কি হল? সেই যে আপনার রেফারেন্সে এসেছিল?

—কিন্তু আজ যে আমার লাগবেই?

ভূধরবাবু হেসে বলেন—হঠাৎ জরুরী? কি ব্যাপার?

—তখনই বলব ভেবেছিলাম, শুনলাম বেরিয়ে যাচ্ছেন···অন্তত পঞ্চাশ টাকা!

—অত টাকা তো নেই! কি করবেন?

—কতগুলো অষুধ লাগবে, বাবা-মা দুজনেরই শরীরটা খারাপ।

ভূধরবাবু গম্ভীর হয়ে ভাবলেন। পকেটের পার্স খুলে তিনটে দশ টাকার নোট বার করে বললেন—পার্সোনাল দিচ্ছি, আজকের মত চালিয়ে নিন। বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা মনে রাখবেন, বলছিলেন আপনার কে পরিচিত কমিশনে বিজ্ঞাপন যোগাড় করে দেয়।

প্রিয়নাথ টাকা কটি বুক পকেটে গুঁজে মনে মনে ভাবে যা আদায় করা যায়! যে আশ্বাস-পরিকল্পনা শুনিয়ে প্রিয়নাথকে ডেকে আনা হয়েছিল. মাস দশেকের মধ্যে বুঝতে পেরেছে, সব মিথ্যা। কাগজের সার্বিক উন্নতিতে ভূধরবাবুর কোন ইচ্ছা নেই, ব্ল্যাকে নিউজ-প্রিন্ট বিক্রি এবং বিজ্ঞাপনে টাকা যোগাড়ই তার ধান্দা।

টাকা নিয়ে মনে মনে বিরক্তি ও হীনমন্যতা নিয়ে প্রিয়নাথ দেবব্রতকে বলল—বেরোব আমি, দেখে দিও সব। হ্যাঁ. তোমার কবিতার ফাইলে তথাগত সেনের একটা কবিতা আছে, পারলে এ রোববার দিয়ে দিও। তারপর ব্রজেশবাবুকে ডাকিয়ে সমস্ত কিছু মোটামুটি বুঝিয়ে ঝোলাটি কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

উজান ঠেলে কলেজষ্ট্রীট যেতে হবে তাকে। কলেজষ্ট্রীটের মোড়ের একটা অষুধের দোকানে ট্যাবলেটটা সস্তায় পাওয়া যায়, গড়িয়া-হাটের দোকান থেকে প্রতি ট্যাবলেটে দশপয়সা কম। ট্রাম থেকে নেমে ঘড়ি দেখল প্রিয়নাথ। ঘণ্টাখানেক লাগল এটুকু পথ আসতে। শিয়ালদার ফ্লাইওভারের জন্য ট্রামের পথ ঘুরে গেছে, সমস্ত এলাকাটা বোতলের মুখের মত সরু। লেগেই আছে জ্যাম। আটটা-নটার পরও জ্যামমুক্ত হয় না। ওষুধ কিনে ফিরতেই গাড়ির জানালা দিয়ে কে যেন ডাকল—প্রিয়দা! বাদামী রংয়ের এ্যাম্বাসাডার ফুটের পাশে থামতেই সুবেশ মহিলাটি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে বলে—

চিনতে পারছো।

—অনুরাধা না?

—ঠিক। কোথায় চললে?

—বাসায় ফিরব।

—কাকুলিয়াতেই আছ? বাব্বা! কতদিন পর দেখা! কলেজ ছাড়ার পর তোমার সঙ্গে দেখাই হয়নি। চল গড়িয়াহাট নামিয়ে দেব।

গাড়িতে উঠে অনুরাধার স্বামীর সঙ্গে আলাপ হয়। ভদ্রলোক খুব হাসিখুশি, মধ্যবয়স্ক। প্রিয়নাথের মতই বয়স।কিন্তু সহজে বয়সটা ধরা যায় না। সম্প্রতি একটা চিট ফাণ্ডের ডাইরেকটরদের একজন।

অনুরাধা কলেজজীবনে প্রিয়নাথের সঙ্গে ছাত্র-সংগঠন করত, খুব জঙ্গী মেয়ে ছিল। কলেজে পড়তে পড়তেই প্রিয়নাথ শুনেছিল বড় লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তা প্রায় পঁচিশ বছর হতে চলল। অনেকের সঙ্গেই পথেঘাটে দেখা হয়েছে, অনুরাধার কথা ভুলেই গেছল।

—তুবি খুব বুড়িয়ে গেছ প্রিয়দা।

—বয়সটাতো কম হল না!

—সত্যি! কোন কাগজে আঁছ, তোমার লেখা অবিশ্যি মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।

—ও সব পড়ার সময় পাও এখনও?

—সময় পাই না। ছেলে-মেয়েদের নিয়েই ব্যস্ত। তবু রক্তের জিনিশ যাবে কোথায়?

অনুরাধার স্বামী সুপ্রিয়বাবু সিগেরেট অফার করেন।

—জীবনটাই এমন, সময় আর বার করা যায় না। ওর অবশ্য এ সবে ইনটারেস্ট ছিল। আপনার লেখার কথা শুনেছি। কোন কাগজে আছেন? প্রিয়নাথ ছোট্ট দৈনিকটার কথা বলে। সুপ্রিয় বাবু মাথা নাড়লেন—ওঃ! ভূধরবাবুর কাগজ?

—চেনেন? প্রিয়নাথ যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেছে।

—চিনি মানে আমাদের মস্ত ক্লায়েন্ট! খুব করিৎকর্ম্মা লোক মশাই!

—তা না হলে কাগজ চালানো যায়!

সুপ্রিয়বাবু হেসে বলেন—আপনারা কিন্তু আমাদের সম্পর্কে বেশ কয়েকটা ড্যামেজিং নিউজ ছেপেছেন। প্রিয়নাথ হেসে বলে—ভূধর বাবুর আপত্তি ছিল না কিন্তু! অনুরাধা বাধা দিয়ে বলে—রাখবে তোমার বিজনেসের কথা! অন্য প্রসঙ্গ বল তো? প্রিয়দা, শোভা, মল্লিকা, দিলীপ, প্রশান্তদের কি খবর?

—মল্লিকা দুর্গাপুর।

—হ্যাঁ. একবার দেখা হয়েছিল। ওর স্বামী তো ইঞ্জিনিয়ার।

—প্রশান্ত ফরেনে; দিলীপের খবর জান না?

—না। অনুরাধা উদগ্রীব হয়। আমার সঙ্গে লাস্ট সিক্স্টি সেভেনে দেখা হয়েছিল।

—বহরমপুর জেলে খুন হয়েছে।

—নকশাল হয়ে গেছল দিলীপ?

—হ্যাঁ, সেভেন্টির প্রথমেই জয়েন করেছিল। মল্লিকার খবর জানি না।

অনুরাধা মুহূর্তের জন্য চুপ করে থাকে। সুপ্রিয়বাবু সিগেরেটের টুকরোটা ছুঁড়ে দিয়ে বলে—প্রিয়নাথবাবু! আমাদের কেসের লেটেস্ট রায়টা পড়েছেন? হাইকোর্ট যা দিল? প্রিয়নাথের ছোট্ট 'হুঁ', অনুরাধা ডানহাতের মনিবন্ধ ঘোরালো, বড় ডায়ালের ঘড়ি! টিক্ টিক্ শব্দে কি সংগোপনে সময়ের বিপুল, অনন্ত, অক্লান্ত স্রোতের সাক্ষী হয়ে ঘুরে চলেছে!

—মল্লিকার লাক্‌টাও স্যাড, জানো প্রিয়দা? ডিভোর্স হয়ে গেছে। ভালো অভিনয় করতে পারত, কলেজ-সোস্যালে দেখেছতো? এখন একটা গ্রুপ থিয়েটার নিয়ে আছে।

প্রিয়নাথের নতুন অভিজ্ঞতা হয়। এই কলকাতায় উঠে আসবার

পর বাবাকে লক্ষ্য করে দেখত, পুরোন দিনের কথা, স্মৃতি বা ঘটনা শুনলেই কেমন বেমনা হয়ে পড়তেন। রাস্তাঘাটে দেশের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অমুক কেমন আছে, তমুক কোথায় আছে ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতেন। প্রিয়নাথ বুঝতে পারত না এর মধ্যে আকর্ষণ কোথায়। এখন মনে হল, অনুরাধা খুঁড়ে খুঁড়ে যত চরিত্রের নাম তুলছে, ততই মনটা অদ্ভুত রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে স্রোতের বেগে নতুন এক জগতে পৌঁছে যাচ্ছে সে। খোকার কি এ উপলব্ধি হয়? হয়ত সেও উপলব্ধি করবে একদিন!

গড়িয়াহাট নামিয়ে দিয়ে অনুরাধা প্রিয়নাথের ঠিকানা নিল টু. বি ফাকুলিয়া রোড এবং নিজের ঠিকানা, ফোননম্বর দিয়ে বলে—আসছ কিন্তু তুমি? না, না, দায় সারলে হবেনা, বেশ আমি টেলিফোন করব তোমায়, নম্বর দাও।

—আমার টেলিফোন নেই।

সুপ্রিয়বাবু রসিকতা করেন—সাংবাদিক লোক মশাই, টেলিফোন রাখেন না!

প্রিয়নাথ হেসে বলে—ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে চাই। এই দেখুন না অনুরাধা টেলিফোনে ছুঁতে পারছে না। সুপ্রিয়বাবু হেসে বলেন—না, না, আসবেন একদিন। আপনার কথা ওর মুখে অনেক-দিন শুনেছি। গাড়ি চলে যায়।

প্রিয়নাথ অতীত রোমন্থন করতে করতে হেঁটে আসে। বেশ ভাল লাগে, গভীর লাগে নিজেকে। ভাবল, একটু আগেই ফেরা গেছে, বাবা ঘুমিয়ে পড়বেন না। দাস কেবিনে উঁকি দিয়ে দেখল ঝাঁপটা প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। দাস দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। আজ তো তেমন রাত হয়নি?

—তোমার অপেক্ষায় আছি, প্রিয়দা!

—এখনি দোকান বন্ধ হচ্ছে?

—শরীরটা ভালো কয় না! চোখতুইখান কড়্ কড়্ করে,

উঠবো। গা হাত পা ব্যথা! অনেক আগেই যাইতাম, তোমার জন্যই আছি।

—কেন?

—সকালে কই নাই, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—চায়ের অর্ডার দাও, দোকান বন্ধ করলে কথা হবে?

—আইজ চা থাউক, চলো হাঁটতে হাঁটতে কথা কই। প্রিয়নাথেরও মনে পড়ল এডলফিনের কথা, বাবা নিশ্চয়ই ঘুমোতে যান নি। দাসের এমন কি কথা, যা গোপনে বলতে হবে?

যা ভেবেছিল তাই। দোকান ভাঙ্গার ব্যাপার। দাস ধরেছে, প্রিয়নাথকে উপরমহলের কাছে ওর ব্যাপারে একটু ধরাকরার জন্য। প্রিয় বলে—শীতল তুমি জান না, আজকাল আমাদের কথা কেউ রাখে না, নতুন ছেলেপেলেরা এসে গেছে! তা ছাড়া এগুলো ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক, সি এম ডি-এর ব্যাপার, ব্যক্তিগত তদ্বিরে কোন কাজ হবে না।

—তুমি পুরানো লোক, শুনবো না তোমার কথা?

—না, শুনবে না। নিজের বেকার বোনটার জন্য বলেছি? কখনো বলব না। তুমি জোর করেছিলে বলে, তোমার ভাই বিমলের বিধবা বউটার জন্য ঘোরাঘুরি করেছিলাম।

—তাও কিছু হইল না।

—তবে? আমরা কে? এককালে কি করেছি না করেছি ভুলে যাও। এই কাকুলিয়ার নীচু জমিতে তুমি আমিতো লম্ফ জ্বালিয়ে লাফালাফি করেছিলাম। কোন শালা ছিল তখন? এখন জিজ্ঞেস কর, আদিনাথ রায়ের নাম কেউ জানে না। দুঃখের কথা তোমায় কি বলব দাস! বেঁচে গেছ মোগলাইখানাটা খুলে। কোথায় তলিয়ে যেতে!

—ভাই-বউটার চাকরি হইলে ভাল হইত! অর দিকে তাকাইতে পারি না!

—কেন, গাড়ি থামিয়ে তোমার দোকানে যারা মোগলাই খায়, দু চার জনকে ধর, ঘরটা যাতে ভাঙ্গা না পড়ে।

—সব শালা হারামি। শরীর খান জ্বলে আমার! বিমলের খবর খান পুলিশরে যে দিছিল সেও যখন আইসা মোগলাই চায়, তুমি বুঝতেই পার। আমিও শোধ নেই শালা। পচা তেল আর মশলা দিয়া প্যাট পচাইয়া দিতাছি। মর শালারা! ভুইগা মর।

ওরা ফুট ধরে এগোয়। মাঝে মাঝে দু চারটে গাড়ি ফুটের পাশে থামে। মালিক নেমে ফুল কেনে, কখনও বা থামস-আপ সোডা।

প্রিয়নাথ শীতলকে জিজ্ঞেস করে—আজকাল মদ খেতেও ফুল লাগে নাকি?

—কি জানি? অখন ভাবি সোডা আর কোলড্রিংকস বেচলে কাম দিত! লাখ লাখ টাকা পকেট কাটতে পারতাম!

—সত্যি, দিনের বেলা বোঝাই যায় না, এত ড্রিংকস কারা খায়?

—আমি তো দিন রাত দোকানে থাকি, কইলকাতাখান যে কি হইছে, তুমি ভাবতে পারবা না! এই দেখ কত রাত হইল গ্যাস জ্বালাইয়া ঘুঘনি, ফুলুরির দোকান খুলছে! সব শালারা মাল টানার জন্য কিনা নিবো। পুলিশের যত দৌড় লাইনের বস্তী গুলানের দিকে।

—তাইতো ভাবি দাস, ছেলেটাকে নিয়ে কি করি। কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে।

কেউ কথা বলে না, গাড়ির হর্ণ, রিক্সার ঠনঠান বাঁচিয়ে বাড়ির দিকে পা চালায়।

বিকেলের কি কোন রং আছে? কিংবা বিশেষ কোন অনুভূতি? এই ইট কাঠ পাথরের সুউচ্চ দালানকোঠার মাঝে বিকেলের সামান্য অবসরটুকুতে মঞ্জু যখন বারান্দায় একটা মোড়া নিয়ে বসে, করুণ বিষণ্ন বিকেলের মায়াবি ছায়া তখন তাকে যেন চেপে ধরে। বাইরে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে চুল আঁচড়ালে পাশের দালানকোঠার দু-চারটে বৌ-ঝি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। যেমন করে ঐ টালি বা

খোলার চালার মেয়েবউয়ের দিকে তাকায়, মঞ্জুর প্রতিও যেন একই মনোভাব। প্রথম প্রথম মঞ্জুর বিশ্রী লাগত, ওরা কি চুল আঁচড়ায় না? হয়তো আঁচড়ায় ড্রেসিং টেবিলের সামনে গ্রোভেল দিয়ে কিংবা লেডিজ হেয়ার ড্রেসিং—গড়িয়াহাটার আনাচেকানাচে আধুনিক যে কটা দোকান গজিয়ে উঠেছে—সেখানে! কিন্তু মঞ্জু? সে জানে প্রিয়নাথকে এ জীবনে সে ড্রেসিং টেবিল কিনে দেয়ার আবদার করতে পারবে না। মাঝে মাঝে আপশোষ হয় তার, অনুশোচনা জন্মে। এ জীবনটা তো দুবার করে পাওয়া যাবে না।

একটু আগে গা ধুয়ে সে এখানে বসেছে। বাসন মেজে উনুনে রুটি সেঁকে তবে এইটুকু মুক্তি! রান্নাঘরের পাশে একটা পেয়ারা গাছ, সামান্য ছায়া—মঞ্জু ওখানে বাসন মাজে। পাশে আকাশখোলা স্নানের ঘর। বাসনে ছাই ঘষতে শুরু করলেই হাজার হাজার মশা ছেঁকে ধরে। বালিগঞ্জের মশা নাম করা। বাসন মাজতে মাজতে পাশের বাড়ির দোতলার খোলা জানলা থেকে দু এক জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। একটু লজ্জাই লাগে মঞ্জুর। তবুও করতে হয় তাকে। কল্যাণী বাসনে হাত দেয় না। দেয় না বলে মঞ্জুর মাঝে মাঝে অভিমান হয়। কিন্তু বোঝে কল্যণীকে এর মধ্যে টেনে এনে কি লাভ! মেয়েটাকে পার তো করতে হবে। তার বাপের বাড়ি গ্রামের দিকে, খুবই দরিদ্র পিতা মাতার সন্তান সে, ছাই ঘাস দিয়ে বাসন মাজা তার অভ্যেস আছে। কিন্তু কল্যাণী গরীব-ঘরের হলেও, জন্ম থেকেই সে বালিগঞ্জে আছে।

বারান্দায় বসে বসে হাই তুলতে হয় তাকে। প্রিয়নাথ এ সময়ে কোনদিনই বাসায় থাকে না, আদিনাথ হয়তো লাঠিখানা নিয়ে বেরোন আশপাশে কোথাও। কল্যাণীর কোন ঠিকঠিকানা নেই, আর নীরজা দেবী প্রায়ই বাত, প্রেসারে ভোগে, পুটুলির মত শুয়ে থাকে বিছানায়। প্রায়ই লোডশেডিং থাকে এ সময়টা। শাশুড়ির ঘরে হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে, মঞ্জু চুপচাপ বসে থাকে বারান্দায়। কোন কথা না বলতে পারার যন্ত্রণা ভয়ানক বুকে বাজে তার। কেমন ভারি

হয়ে থাকে মাথাটা। একদিন, এ এলাকাতেই, তার শ্বশুরকে ঘিরে কত মানুষ আসত, প্রিয়নাথের খোঁজ করত—কোথায় গেল তারা? ঢাকুরিয়া ব্রীজ, বিজন সেতু, গোল পার্ক হয়ে যাবার পর কেমন যেন ভোজবাজির মত এলাকাটা পাল্টে গেছে। মঞ্জুর মনে হয় এখন কোন ভুল ঠিকানায় ঢুকে পড়েছে তারা। তার নিজের বাসারই কত পরিবর্তন দেখল। চোখের সামনে কার্নিশের বটগাছটা বাড়ল, ফাটল এল ছাদে, কড়ি-বর্গার ঘুন ঝরতে লাগল, জানলার শিকগুলো জল হাওয়ায় ক্ষয়ে সরু হয়ে গেল, একটু শক্তহাতে টান দিলে মট্ করে ভেঙ্গে যাবে।

মঞ্জু বিকেলের শেষ দিকে এ বারান্দায় বসলেই খোলার চালার বউটি মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ছোট পাঁচিলটা দিয়ে মুখ বার করত—কেমন আছ দিদি?

—ভালো। তুমি কেমন?

—আছি! সন্দে দাওনি? বিকেলের রান্না হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—আমার তো হোলোনি! প্যালার বাপ সেই রাতে ফিরবে। ভাবনু নুকিয়ে সিন্‌মা দেকে আসি!

—তাই বুঝি?

—'মেনকা'র সিন্‌মাটা দেখেছ?

—না।

—ভাবনু, সন্দের শোটা দেখি, ভয় নাগল প্যালার বাপ এলে ঠিক ধরে ফেলবে। ছুটতে ছুটতে এনু। লোকটা সেই দেরিই করল, আমার আর সিন্‌মা দেখা হলনি।

মঞ্জুর ভালো লাগে না। বড় স্থূল, অপটু এদের জীবন। একদা এককালের ভাঙ্গা বস্তীর শেষ ভগ্নাংশটুকু আশ্রয় করে এখনও গোটা ছয় সাত পরিবার আছে। ছোটখাট কারখানা বা দোকানপত্তরে কাজ-কারবার করে জীবিকা চালায়। মঞ্জু প্রথম প্রথম এদের সঙ্গেই বিকেলে কথাবার্তা বলত। কিন্তু ওদের আন্তরিকতা সত্ত্বেও কোথায়

যেন স্থূলতা। মঞ্জু সুরে সুর মেলাতে পারে না। ডলি বলে বউটি একদিন হেসে মঞ্জুকে বলেছিল—দিদি, কেমন ঠেকছে যেন? মঞ্জু অবাক। মৃদু হেসে বলে—কেন? ডলি মিটি মিটি হাসে, পেটের দিকে তাকিয়ে বলে—সুবিধে নাগছে না! ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ?

মঞ্জুর ব্যক্তিত্বে ভয়ানক বেজেছিল সেদিন। ঠিক করেছিল আলাপ আলোচনার, মেলামেশার সীমারেখা টানা দরকার। ডলির উপর করুণা হয় মঞ্জুর। সামান্য হেসে বলেছিল—কাজে যাও ডলি। এ ভাবে কথা বলে না।

ডলি কিছুদিন কথা বলেনি বটে, আবার এক বিকেলে পাঁচিলে মাথা তুলে করুণ মুখে বলেছিল——দিদি, পাঁচড়ার কোন মলম আছে খোকার সেবার হয়েছিল যখন? দেখ না, প্যালার বাপকে বলি রোজ ভুলে যায়।

—আছে কিন্তু সেতো পুরোনো হয়ে গেছে?

—তাই দাও, ছেলেটাকে মাখিয়ে দেখি।

মঞ্জুর সত্যিই খারাপ লেগেছিল, মায়া হয়েছিল ডলির উপর। তবে কথাবার্তার ক্ষেত্রে মঞ্জু সীমারেখা টেনে চলে। কোন কোন দিন ডলি হয়ত বলে—রান্না হয়ে গেছে দিদি? তোমার উনুনটা দেবে?

—কেন?

—কয়লা ফুরিয়ে গেছে। জল ঝড়ে গুল দিতে পারিনি।

মঞ্জু ডলিকে ফিরিয়ে দিতে পারে না।

খোকাকে নিয়ে মঞ্জুর চিন্তা হয় আজকাল। ছেলেটা কেমন দিন রাত গুম মেরে থাকে। ঘড়িটা ভেঙ্গে ফেলার পর থেকে নিশ্চয়ই স্কুলে ওর ওপর ঠাট্টা বিদ্রূপ বলে। মাস্টারমশাইরাও কেমন! ওর পোষাক, রুটি খাওয়া, কথাবার্তায় মুচকি হাসে। বিকেলেও খোকা বাসায় বসে থাকে বলে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছে দাদুর সঙ্গে। দাদুর সঙ্গে বেড়াতে যেতে লজ্জা বোধ করে। টুকাই গলির মোড়ে সাইকেল চালায়, পেছন পেছন ঘোরে তার। চড়তে চাইলে দেয় না, বলে, ভালো করে ঠেল, চড়তে দেব! ফালতু খাটিয়ে টুকাই হাসতে

হাসতে সাইকেল নিয়ে বাড়ি চলে যায়। খোকার চোখ ফেটে জল আসে। একদিন কাঁদতে কাঁদতে মাকে বলেছিল—সাইকেল কিনে দেবে মা?

—ভালো করে পাশ কর। সাইকেল কিনে দেব।

—ছাই দেবে! খোকাও যেন ধরে ফেলেছে মঞ্জুর এই স্তোক বাক্য। ইচ্ছে হয় ছেলেটাকে চড় কষিয়ে দেয়। আবার দুঃখও হয়। মনে হয় খোকা যেন ক্রমশ স্বার্থপর হয়ে উঠছে।

কোন কোন দিন নির্জন বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকলে লাগোয়া তিনতলা বাড়ির বৃদ্ধা ক্বচিৎ জিজ্ঞেস করে—আর পারি নে বাপু, কি মশা! তোমাদের মশা লাগে না? মঞ্জু হেসে বলে—লাগবে না কেন? কি করব বলুন!

—ফ্লিট, বেগন স্প্রে, কোন কিছুতে কাজ হয় না। রোজ ভাবি কেমন করে যে থাক তুমি! রান্না হয়ে গেছে?

—ও আমি বিকেলেই সেরে ফেলি।

স্থূলাঙ্গিনী বৃদ্ধা হাসতে হাসতে বলে—তোলা উনুন তোমার বোধ হয়? কি ধোঁয়া, জানলা খুলতে পারি না। ছেলের বউ বলছিল, সরিয়ে আঁচ দিলে ভালো হয়।

মঞ্জু চুপ করে থাকে। খানিক ভেবে মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করে—তোলা উনুন আপনারা ব্যবহার করেন না?

—না বাপু। আমাদের ধোঁয়ার কারবার নেই, গ্যাসের রান্না অনেক ভালো।

—হ্যাঁ, হাঙ্গামা কম।

—খরচা বেশি হলেও শান্তি আছে। তোমরাও গ্যাসের দরখাস্ত করতে পার, অবিশ্যি খরচা দিয়ে তোমরা পোষাতে পারবে কি? মনে হল মঞ্জুকে কে যেন কষাঘাত করল। এ যেন আভিজাত্যের হুল। মর্মে গিয়ে বেঁধে। ভাবল কি সুন্দর ভাবে ধোঁয়ার জন্য প্রতিবাদ করে গেল। তবুওতো বৃদ্ধা মুখ ফুটে বলল কিছু, বাড়ির অন্যান্যরা ন করে না হেলে পড়া বাসাটায় মানুষ থাকে। সকাল সন্ধ্যা

কুকুরটা এনে সদরের সামনে পায়খানা করায়, যেন অধিকার ওদের। গন্ধ আসে না? আমি রান্নারকালে ফ্যান ফেললে অশ্রাব্য কথা শোনায়, কই আমরা কিছু বলতে গেছি? তাছাড়া ধোঁয়ায় জানলা বন্ধ কর কিন্তু……। একদিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। আকাশ-খোলা বাথরুমটায় কল্যাণী স্নান করছিল। স্বভাবতই মেয়েরা একটু দৃষ্টি সজাগ। কুলুঙ্গির মধ্যে ব্লাউজ, বডিস, শাড়ি খুলে গুঁজতে গুঁজতে কল্যাণীর কেমন প্রায়ই মনে হয়, দোতলার বন্ধ জানালা একটু নড়া-চড়া করে। কোন দিন লোক খুঁজে পায় না। বড় বিরক্ত লাগে, বলতে সাহস পায় না। কুমারী মেয়েরা একান্ত গোপন সময়গুলোকে খুব ভালবাসে। এই ইট কাঠ জঙ্গলের ভীড়ে তাও সম্ভব নয়। এক দিন হঠাৎ শাড়ি পেঁচিয়ে ভেজা শরীরটা নিয়ে আতঙ্কে লাফিয়ে রান্না-ঘরে ঢুকে বলেছিল—অসভ্য! ইতর! করুণ মুখে তাকিয়েছিল কল্যাণী। মঞ্জুর বুঝতে অসুবিধে হয়নি। খোলা চালটার দিকে তাকিয়ে ও-বাড়ির দোতলার জানালায় চোখ রেখে রি রি করে উঠে-ছিল দেহ। কার কাছে প্রতিবাদ করবে। লজ্জা, ক্রোধ হজম করে আদিনাথকে বলেছিল—বাবা, বাসায় ছেঁড়া পলিথিন বা চট নেই?

—কেন?

—বাথরুমটায় ছাউনি না দিলে আর চলছে না।

বৃদ্ধ পুরু চশমায় দূরবীনের মতো বিষয়টা সরজমিনে তদন্ত করে ছেলের বউকে সঙ্গে নিয়ে চট ফেলে ইট চাপা দিয়েছিলেন।

সুরমাকে ও-বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে মঞ্জু ডাক দেয়—সুরমা, কি ব্যাপার তোমার? সাতদিন কোন পাত্তা নেই।

—কেন? আমার মেয়েকে পাটিয়েছিলুম তো। বলেনি?

—না।

—তুমি অন্য লোক দেখ বৌদি! ও টাকায় ঠিকে কাজ পোষায় না।

সুরমা কাছে এসে দাঁড়াতে মঞ্জু জিজ্ঞেস করে—ও বাড়িতে কত পাও

—সে তুমি দিতে পারবে নি! মেয়েটা বললো টি. পি বাড়িতে কাজ করবে। ছুঁড়িটার আবার গান বাজনা দেখার শখ!

—অন্য লোক ব্যবস্থা করে দাও তাহলে?

—কাকে পাই বল! ঐ গলির মুখের উকিলবাবু কত করে বললেন, তাকেই দিতে পারলুম না! সুরমা চোখ-মুখ উল্টে এমন ভাব-ভঙ্গিতে কথা বলে যেন ও-সব বাড়িতে কাজ করে আভিজাত্য বেড়ে গেছে। সত্যিইতো মঞ্জুর বাসায় কাজ করবে কেন ওরা। টি. ভি, ফ্রিজ নেই এ বাড়িতে। অত টাকাও দিতে পারে না সে। আশপাশের প্রতিবেশীরা টাকার জন্য ভাবে না, খাটিয়ে লোক চাই তাদের। নিজের মাথা কুটতে ইচ্ছে করে মঞ্জুর। এ ভাবে বাস করা যায় না।

মাঝে মাঝে সামনের বাড়ির বৃদ্ধার পুত্রবধূর সঙ্গে মুখোমুখি হলে হেসে বলে—সন্ধ্যায় আসতে পারেন তো আমাদের বাড়ি? শনিবার টি. ভি-তে ভালো সিনেমা হয়। মঞ্জু হেসে বলে—সময় পাইনা একদম। সুযোগ পেলে যাবো। মনে মনে সে ভাবে খোকাকে তোমরা একদিন রাস্তার ছেলের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলে। খোকার বন্ধু বুবাই, তোমার ছেলে, খেলার দিন ডেকে ডেকে টি. ভি. দেখাতে নিয়ে যেত। বুবাই মোহনবাগানের সমর্থক, খোকা ইষ্টবেঙ্গলের। একদিন সন্ধ্যায় বাচ্চাদের একটা সিনেমা দেখতে খোকা দরজা ঠেলে ঢুকতেই, তুমি দড়াম করে দরজা বন্ধ করতে করতে বলেছিলে—এখন যাও খোকা! বুবাই খাবে। খোকা আহত অভিমানে ফিরে এসেছিল। খোকার ফিরে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে বলেছিলে—আদিখ্যেতা! রাত দিন জ্বালিয়ে খেলে! বাপের জন্মে টি. ভি. দেখেনি!

তুমি লক্ষ্য করনি, ফিকে অন্ধকারে বারান্দায় মোড়া নিয়ে বসেছিলাম আমি। আমার বুকটা ফেটে গেছল সেদিন। ঘরে ঢুকতেই খোকাকে চড় দিয়েছিলাম—যাস্ কেন মরতে? বুকটা আমার হু হু কেঁদে উঠেছিল। রাগ হয়েছিল স্বামী শ্বশুরের উপর। দেশ বিভাগ তো লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনেই ঘটেছিল। দাঁড়ায়নি তাদের

ছেলেপুলে নাতিরা ? এই তো নতুন ঘর-বাড়ির লোকেদের অনেকেই ওপার থেকে এসেছিল, আসেনি প্রফুল্লবাবুরা একসঙ্গে ? শ্বশুর বলবেন আদর্শ, নীতিবোধ, জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা ! কি হবে যদি জীবনে কষ্টই করে গেলাম ?

টি. ভি. দেখার প্রস্তাব হাসতে হাসতে প্রত্যাখ্যান করে মঞ্জু চোখের সামনে ভাঙ্গা কপাটজোড়া বন্ধ করে অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাইল। আদিনাথ ফিরে এসেছে, লাঠিটা গজালে টাঙ্গিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—একটু চা হবে বৌমা ? শরীরটা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে।

—উনুন নিভিয়ে ফেলেছি বাবা।

—থাক্। তবে থাক !

নীরজাদেবী জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে খিন খিনে গলায় বলল—কাগজ জ্বালিয়ে করতে পারবে না বউমা ? কল্যাণী সেলাই করছিল। বৌদির এ জবাবে রাগ হল তার। সূচ সুতো রেখে উঠতে উঠতে বলল—আমিই যাই। হাতিঘোড়া তো নয়, চেয়েছে এককাপ চা।

—ছাইগুলো ঝাঁট দিয়ে ফেলো কল্যাণী।

—তা জানি।

—পরশু কাগজের পোড়া ছাইতে ঘর ভরে গেছল ?

—পরশু ? পরশু রাতে আবার চা হোল কোথায় ?

—কেন, মা চাইতে কাগজ জ্বালিয়ে করে দিলে না তুমি ?

নীরজাদেবী ও-ঘর থেকে বলে ওঠে—আমি আবার কখন খেলাম বৌমা ? আদিনাথ প্রতিবাদ করে বলেন—চুপ করবে ? না খেলে কি বানিয়ে বলছে ? স্টোভটা কাল দিও তো বউমা, ঝালাই করিয়ে আনব। ঝালাইকরও দেখি না ছাই, আগে কত ছিল !

আগে অনেক কিছুই টু বি কাকুলিয়াতে পেতেন তিনি। চুলকাটার জন্য বাড়ি বাড়ি-ঘোরা নাপিত উঠে গেছে, সেলুনে দুটাকার কম চুলকাটানো যায় না। ধোপা নেই, এসেছে ব্যাণ্ডবকস ! ছুতোর, কামার—টুকটাক কাজের জন্য বছর দশেক আগেও আদিনাথ সন্ধান করে পেতেন। এখন মানুষের এ সমস্যাগুলো কি মিটে গেছে ?

তিনি বুঝে উঠতে পারেন না।

মঞ্জু আর এ প্রসঙ্গ নিয়ে লেবু কচলায় না। রেডিওটা আস্তে চালিয়ে কোন একটা পত্রিকা উল্টোতে থাকে। খোকা পড়ছে। মাঝে মাঝে আদিনাথ এসে খোঁজ খবর নেন। মঞ্জুর মনে হল খোকা যেন দাদুকে এড়িয়ে যেতে চায়।

—কি পড়ছিস ?

—কেন ? পড়ছি যা পড়ার !

মঞ্জুর ধমকে খোকা গজগজ করতেই আদিনাথ বলেন—পড়ার বিষয়ের নাম নেই ? তাই বলো, জীবনবিজ্ঞান পড়ছ ! খোকা বলে—জীবনবিজ্ঞান তুমি বুঝবে ?

—পড়ে নিলে বুঝব। আমাদের সময় জীবনবিজ্ঞান ছিল ?

—খুব শক্ত, কিছু বুঝি না। ওদের সবার মাস্টার আছে, কি সুন্দর বুঝিয়ে দেয় ! আমার জন্য মাস্টার রাখতে পার না দাদু ?

আদিনাথ বলেন—জীবনবিজ্ঞান মানে বায়লজি ! বায়লজি বোঝার কি আছে ? মুখস্ত করবি।

—তোমায় বলেছে ! আমাদের ফার্স্ট বয় এক প্রফেসারের কাছে পড়ে।

—পড়ে বেশ করে, তুই কি ফার্স্ট হোস ? ফার্স্ট হলে মাস্টার রেখে দেব। মঞ্জু দাদুর হয়ে বলে। খোকা বলে—টুপি দিও না ! সব বুঝি আমি !

আদিনাথ মুখ তুলে বলেন—কি বললে ? কি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করলে ?

খোকা ভুরু কুঁচকে চুপ করে থাকে। আদিনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—টোটাল ডেসট্রাকসন ! আমার বাসায় কোন দিন এ ভাষা কেউ শোনেনি। প্রিয়নাথকে জিজ্ঞেস করলেন—এই তোমরা সমাজ পাল্টালে ? খোকা গুম হয়ে নখ দিয়ে বই খুঁটতে থাকে।

৬

কল্যাণীদের বাসার সমস্যা, এককথায় বলতে গেলে অস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে সুবিমল অবসরে অনেকসময় ভেবেছে। একটা সমস্যা বটে! প্রিয়দার তো এত যোগাযোগ, খবরের কাগজেও চাকরি করে, কলকাতার কোথাও বাসা ঠিক করে নিতে পারে না? কয়েক লাখ টাকার সুযোগ, কমলেশবাবু ছাড়বেন কেন? যা মোট জমি, ফ্ল্যাট সিস্টেমে ভাড়া দিলে কয়েক হাজার টাকা আসবে মাসকাবারে। কলকাতায় যা গৃহসমস্যা, একএকটা ফ্ল্যাট হাজার বারোশো টাকায় ভাড়া নিতে মুখিয়ে আছে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন হাই-অফিসিয়ালরা।

ডাইনিং টেবিলে খেতে খেতে হঠাৎ সুবিমল দাদাকে বলে—কমলেশবাবুকে তুমি একটা ব্যাপারে বলবে? সুরঞ্জন চামচে স্যুপ তুলতে তুলতে বলে—কিসের? তোর বিজনেসের ব্যাপারে? লিলি সন্ধিগ্ধ চিত্তে সুবিমলের দিকে চোখ তুলল। সুবিমল লিলির দিকে মুচকি হেসে বলে—না, না, আমার বিজনেসে কমলেশবাবু কি করবেন? বলছিলাম মাষ্টারমশাইর···

কথাটা শেষ করা গেল না। সুরঞ্জন হাল্কা ভাবে বলে—ওঃ বাড়িটা বিক্রী? ক্লায়েন্টতো ঠিক হয়ে গেছে। জয়সওয়াল, হাজরার মোড়ে মস্ত বাড়িটা কিনেছে যে।

—তাহলে আর কাকুলিয়ার জমিটা দিয়ে কি করবে?

—বাঃ! ফ্ল্যাট সিষ্টেমে রেট পাবে কত জানিস? ফার্ণরোডটা কেমন জয়েন করে দিচ্ছে গড়িয়াহাটার সঙ্গে! আমার অত টাকা থাকলে আমিই কিনতাম।

—মাষ্টারমশাইরা? ওরা তো মুশকিলে পড়েছে?

লিলি বলে—মুশকিলের কি? সারা কলকাতায় বাসা পাচ্ছে না?

—তা পাবে না কেন, ভাড়া গোনার 'এথি' চাই।

—'এথি' কমের জায়গাও আছে। বেলেঘাটা, ট্যাংরা, বেলগাছিয়ায় সস্তা বাসা নেই?

সুরঞ্জন বলে—না, এখন আর মাষ্টারমশাইরা কলকাতায় বাসা পাবে না. তা যতই আনডেভলপড্ এলাকা হোক্। কলকাতা যে ভাবে ভাঙ্গচুর হচ্ছে—নতুন রাস্তাঘাট, মেট্রোরেল, ফ্লাইওভার হচ্ছে, কোন এলাকা যে রাতারাতি কি হবে তুমি বুঝতে পারছো না। লটারির মত! চট্ করে সস্তায় কেউ নতুন এন্ট্রি দেবে না, খুব ইণ্টারেস্টিং। সুবিমল ঝোলমাখা হাতখানা থামিয়ে বাঁ হাতে চামচে করে সল্ট তুলতে তুলতে বলে—সে না হয় অন্য কোথাও উঠে গেল, কিন্তু এখানে থাকলে আমাদেরও সুবিধে।

সুরঞ্জন বলে—কিসেব?

—প্রীতুর ইংরেজি-বাংলার জন্য তোমায় নতুন করে ভাবতে হচ্ছে না।

সুরঞ্জন আপন মনে ঠোঁটের কোনায় হাসল। কি যেন বলতে গিয়ে দু দুবার ভাবল। শেষে লিলির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেই ফেলল—ওটাতো গ্র্যাটিস্! বাপার অনার! এইটের ছেলে, সপ্তাহে তিনদিন আসে, দেড়শ টাকা দেই,, ও টাকায় প্রীতুর স্কুল-টিচারই রাখতে পারি! প্রমোশনের চিন্তা থাকে না আমার! মাষ্টারমশাইকে জানতে দেই না, আফটার অল দয়া ছাড়া কি! অনেষ্ট লোক, এক কালে ক্লোজলি রিলেটেড ছিলাম!

লিলি তাকায় সুবিমলের দিকে, চোখাচুখি হয়। লিলির চোখেমুখে গর্বিতার ভাব। এ জন্যই কল্যাণী এ বাড়িতে এলে সন্দেহের চোখে দেখা হয়? বহুদিন কল্যাণী হাসতে হাসতে লিলির বিরুদ্ধে অনুযোগ করেছে। সুবিমল বিশ্বাস করেনি। আজ সত্যিই খটকা লাগল তার, বিশেষ করে মাষ্টারমশাই সম্পর্কে দাদার এই মূল্যায়নে। মাষ্টারমশাই যদি জানে তার সম্পর্কে সুরঞ্জনের এই ধারণা? কিংবা কল্যাণীও যদি বোঝে দাদা মাষ্টারমশাইকে দয়া, গ্র্যাটিস্ করছে?

একটু খারাপ লাগল তার। হঠাৎ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেয় সে—থাক্। কমলেশবাবু কি এখুনি বেচবেন?

সে মাল তিনি নন। নিশ্চয়ই মেট্রোরেল কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত দরটা তুলবেন। এখন তিন লাখ, নিশ্চয়ই পাঁচ লাখে উঠবে। সে কটা দিন বাড়িটা মেরামত করে দিক। জল পড়ছে, বাথরুমের ছাদ খোলা। আরে বাবা, ওখানে তো কিছু মানুষ থাকে, গরুছাগল নয়। কি মুস্কিল।

সুরঞ্জন অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। কল্যাণীর সঙ্গে ছোট ভাইয়ের বিশেষ সম্পর্কের স্পষ্ট-অস্পষ্ট ধারণা লিলির কাছ থেকে পেয়েছিল সে। হঠাৎ মনে হল এভাবে খোলাখুলি বলাটা ঠিক হল না। নিশ্চয়ই সুবিমলের ভালো লাগে নি। আর তা ছাড়া, ও বাড়ি সম্পর্কে সুরঞ্জনেরই তো দুর্বলতা থাকা উচিত ছিল, কিংবা সহানুভূতি! সুবিমল তো তখন জন্মায়নি বা খুব ছোট; সুরঞ্জন আর প্রিয়নাথ জীবনের কত বিচিত্রমুহূর্ত সুখদুঃখের ভাগীদার হয়ে কাটিয়েছে। আদিনাথ বুঝতে দেননি প্রফুল্লর ছেলে আর প্রিয়নাথ আলাদা। ছাত্র হিসেবে, মানুষ হিসেবে প্রিয়নাথ সুরঞ্জনের চাইতে অনেক বেশি গুণের অধিকারী। তবু বিচিত্র জীবন-আবর্তনে আজ দুই পরিবার বিপরীত কোটিতে। হয়তো সেদিনের সমান্তরাল গতিপথের সামান্য পরিবর্তনে আজ এই বিরাট ফারাক। আদিনাথ, প্রিয়নাথ যুগকে মানুষকে বিশ্বাস করেছিল, আর প্রফুল্ল সুরঞ্জনদের শিখিয়েছিল নিজেদের ভালোবাসতে। যাক্, ঐ মন্তব্যের পর সুরঞ্জন সহানুভূতিতে বলে—তা ঠিক! সেটা অবশ্যই উচিত কমলেশের। বেচে যখন দিবি তখন না হয় দেখা যাবে। এখন তো বাসাটা সারিয়ে দিবি?

—হয় তো রেন্টকণ্ট্রোলে তিরিশ টাকা পায় বলে।

—আরে, তিরিশ না হয়ে একশ টাকাই দিল। কমলেশের কি আসে যায়!

—একবার বলে দেখবে?

—তা বলে দেখতে পারি।

বিশ্রী ভাবে চেয়ারটা ঠেলে লিলি বেসিনে মুখ ধুতে গেল।

মাসখানেক পর কমলেশের সঙ্গে ওদের বাড়িতেই সুরঞ্জনের সাক্ষাৎ হলো। কর্মক্ষেত্রে প্রায় রোজই সাক্ষাৎ হয় কিন্তু এ সব আলোচনা উপযুক্ত অবসর ছাড়া হয় না। উপরন্তু সুরঞ্জনের মনেও থাকে না সবসময়। পাওয়ার কাট, ব্যাঙ্ক লোন, মনোপলি—হাজার ঝামেলা আছে মাঝারি ব্যবসায়ীদের। দূর থেকে অনেকেই টাকা দেখে কিন্তু পেছনের শ্রম, ঝঞ্ঝাট বুঝতে চায় না! সুরঞ্জন ঘুমের ট্যাবলেট খায়, মাঝে মাঝে টেনশনের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মদ গেলে! অর্থ আছে কিন্তু মনের শান্তি কোথায়?—সুরঞ্জন মনে মনে ভাবে। কোন এক গুরুর শিষ্যত্ব নিয়েছে। মনেরও খোরাক চাই, শক্তিও দরকার! গুরুদেবের কাছে গেলে কি এক অলৌকিক বলে ক্ষত-বিক্ষত মনটাকে সে শান্তির প্রলেপ দিতে পারে। তা ছাড়া একটা এ্যাসোসিয়েসন বা পরিচিতি যাই বলা যাক না কেন, গুরুকে কেন্দ্র করেই তো গড়ে উঠেছে। তাতে অনেক সুবিধে আছে।

সেদিন কমলেশবাবুর বাড়িতে পার্টি ছিল। বিবাহ-বার্ষিকী উপলক্ষে পার্টি। তবে বিবাহের দিনটা উপলক্ষ্যই কেবল, পার্টিটাই আসল। স্ত্রীর সঙ্গে কমলেশের খুব ভালো সম্পর্ক নেই। তবু সেদিনটাকে স্মরণ করছে পার্টির জন্য! পার্টি বলতে আর কিছুই নয়, কলকাতার বুকে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ ঝালিয়ে নেওয়া। আজকাল লোকে যাই বলুক ব্যক্তিগত যোগাযোগ, স্বার্থের বন্ধন না থাকলে শুধু ব্যবসা কেন জীবন, পরিবারের কোন সামাজিক সুবিধে আদায় করা যায় না। ছোটখাট ব্যাপার থানা হাসপাতাল স্কুলে-ভর্তি থেকে শুরু করে যত উপরে ওঠা যাবে কেবলই যোগাযোগের ভেল্কি, পারস্পরিক স্বার্থের বন্ধন। তবে এ যোগাযোগের জন্য চাই অর্থ, ক্ষমতা, সুনাম, বংশ—অনেককিছু।

কমলেশ এ সব ভালো করেই বোঝে। আজকাল সামান্য একটা

লাইসেন্স রিনিউ করতে গেলেও ঘুষ। প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকলে অন্য কথা। কমলেশের বাবা ললিতবাবু ছেলেকে এই জীবনদর্শন শিখিয়েছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন অত্যন্ত সংযমী, ধার্মিক, নিষ্ঠাবান হিন্দু। একান্ত প্রয়োজনে নিজের উন্নতির জন্য, ব্যবসার স্বার্থে ঘুষ, খানাপিনা করাতে পেছ পা ছিলেন না। তবে বাড়িতে এ আবর্জনা টেনে আনতেন না। ছেলে কমলেশ বাবার জীবনদর্শন ভালোভাবে ধাতস্থ করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন করেছে। পার্টির নামে বাড়িতেই মিলিত হয়; ভোগে অনাসক্তি বলতে কিছুই নেই কমলেশের। বাড়িতেই মদ্যপান করে, কলকাতার ভালো হোটেল -বারেও যায় মাঝে মাঝে। তবে রেসের মাঠে বিশেষ যায় না। প্রথম প্রথম সে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই তার মনকে আকর্ষণ করতে পারে না। এ ছাড়া ভয় আছে, হয়ত ঐশ্বর্যের পতন ঘটাতে পারে। তাদের পরিবারে বহু ঘটনা সে দেখেছে। তার এক কাকা ঘোড়ার মাঠেই নিঃস্ব হয়েছিলেন।

পার্টিতে অনেকের মুখই দেখা গেল। এখানে এলে সব যেন বন্ধু হয়ে যায়। কলকাতা পুলিশের অফিসার, সরকারী আমলা, ব্যাঙ্কের কোন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এ ছাড়াও সমাজের আরও লোক যাদের সঙ্গে কমলেশের সরাসরি স্বার্থের যোগ নেই। কমলেশের ব্যক্তিগত বন্ধু তারা। হয়তো নামকরা কোন কবি, ফিল্ম আর্টিষ্ট কিংবা পত্রিকার সাংবাদিক, মাঝারি গোছের রাজনৈতিক নেতা। আসলে কমলেশের পার্টিতে এরা অলঙ্কার। রাজনৈতিক নেতাদের অনেককেই চেনে সুরঞ্জন। পার্টিতে অদ্ভুত একটা বিষয় লক্ষ্য করে সুরঞ্জন। এখানে কোন কাজের কথা হয় না, অন্তত পার্টির মধ্যে কমলেশকে সে ব্যবসাসংক্রান্ত সুযোগসুবিধার জন্য কারও সঙ্গে আলাপ করতে শোনেনি। এখানে মূলত হয় অনর্গল অপ্রয়োজনীয় বকবকানি আর অসম্ভব অশ্লীল কথাবার্তার বহিঃপ্রকাশ। মনে হয় মানুষগুলো মনের হাইড্রেন পরিষ্কার করতে এসেছে! আর চলে সামাজিক

রাজনৈতিক সংক্রান্ত দেশ ও বিদেশের শ্রাদ্ধ। সুরঞ্জন দেখেছে, কবি মানুষ মাতাল হয়ে কত অশ্লীল কথা বলতে পারে. এমনকি বেহেড অবস্থায় প্রকাশ্যে প্যান্ট খুলে কাউচ ডিভানে পেচ্ছাপ পর্যন্ত করে দেয়। সে দেখেছে, হাড় কিপটে পুলিশ অফিসার ঘোর মাতলামির মধ্যেও কেমন নিজের একটি সিগেরেট না বার করেও, অনর্গল দামি সিগেরেট টেনে যাচ্ছে। বাইরের বিরোধিতা ভুলে রাজনৈতিক নেতারা কেমন ঘন হয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে কথা বলে।

তবে এই সব বাড়ির পার্টিতে উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে উঠে না। কারণ মহিলা থাকেই না বলতে গেলে। সুতরাং পার্টি না বলে মদ খাওয়ার আড্ডা বলা যেতে পারে. ঘরখানা লম্বা, তিনতলার কোণে। কমলেশের নির্দেশ আছে এ সমস্ত পার্টির দিনে বাড়ির লোক বা যে কেউ দেখা করতে আসুক অনুমতি পাবে না। অতিথিদের জন্যও কিছু নির্দেশ আছে। সবকিছুই নিজ নিজ হাতে করে নিতে হয়। চাকর বেয়ারা পাওয়া যাবে না' কমলেশের বন্ধুরা মেনে নিয়েছে সেটা।

আজকের আসরটিও বেশ জমে উঠেছিল। কবিটি হঠাৎ জীবনানন্দ দাস আবৃত্তি করতে করতে প্যান্টের বোতামে হাত দিতেই পুলিশ অফিসারটি, কবিরই ব্যক্তিগত বন্ধু,, মুখ খিঁচিয়ে বলল—বাঞ্চোৎ! ওটি বার করলেই পাছায় লাথ কষাব!

—পাছায় লাথ? অমন সুন্দর জায়গায় লাথ?

—সুন্দর জায়গা? সারা ঘরে খুক খুক্ হাসি,—বীরু হচ্ছে কি শালা!

—বাঃ, সুন্দর নয়! মেয়েদেরকে বলি হেগে হেগেই সুন্দর পাছাটা মাটি করলে!

পুলিশ অফিসারটি হাসতে থাকে, মাংসের টুকরো মুখে তুলে পাশের জনকে বলে—শালার ট্যালেণ্ট ছিল! বীরু পকেট থেকে লম্বা দেশী বোতল বার করে বলে—তোমাদের ও-মালে চলবে না আমার! সিগেরেট কই?

ফিল্‌ম আর্টিস্টটি উঠে সিগেরেট দেয়, বলে—যা বলেছিস বীরু!

কমলেশ সেলার খোলে, শব্দ হয়। তারপর সারা ঘরে কে কি কথা বলছে বোঝা যায় না। শুধু হাসি, ধোঁয়া আর নানান বিষয়ে কথার টুকরো :

—সব মালদের চিনি, রাতে রেইড করি তো!

—কি করব মশাই, শুয়োরের বাচ্চারা, লোন রিফাণ্ড করে না, ব্যাঙ্ক তো খলখলে হতে চলল!

—সে কি, রেগুলার রাত কাটাতি? তারপর?

—নার্সিং হোম!

—গাড়োল! ছবি হয়েছে! কোনো কাজ হলো ওটা?

—এটা কোন পলিসি? গভমেন্টের মাথামুণ্ড আছে? একটা নোট দিতে পারে না, মন্ত্রী হয়েছে!

—সেবার কোর্টের রায় মানছে না! আপনাকে তো সেদিন বললাম।

—ডি-এম আপনার বন্ধু? বেশ তো শীতকালে বেড়াতে চলুন। ফরেস্ট বাংলো আছে!

—খাল খিঁচে দেবে বাঞ্চোৎ! তীর ধনুক দেখেছ? ফ্রেস মাল টাকা হলেই পাওয়া যায় না, হুজ্জুত করে!

—কে কণ্ট্রাক্ট নিয়েছিল? শালারা জোচ্চোর, ব্রীজ তো ভাঙ্গবেই! কি বললেন, কমিশন বসছে?

—শুয়োরের মত ঝিমোচ্ছে কেন? শালার কোটে মদ ঢেলে দে।

—সত্যি, গুরুদেব লোক! জানে কিছু! আমার বাড়িতে মশাই ফটো থেকে ছাই ঝরেছে ওনার!

—আমি বললাম আপনার কোঁদলটা মিসেস গান্ধীর কাছে যাবেই!

কমলেশের খুব একটা ধরেনি তখনও। অন্যের বাড়িতে আসর বসলে প্রথমেই সে বেহেড হয়ে পড়ে, নিজের বাড়িতে খুব অল্প খায়। সে জানে মানুষগুলো জানোয়ার, খেয়ে হেগে মুতে একশা করবে।

কাজেই নিজেকে সংযত রাখতে হয়।

এককালে সুরঞ্জন উঠে এসে ফিস ফিস করল—কথা আছে তোব সঙ্গে, বাইরে আয়!

—কি বলছেন ফিস ফিস করে? সরকারী আমলাটি বলে উঠল। কাঁটা চামচ ফেলে ঘোর নেশায় হাত দিয়েই গব্ গব্ করে গিলেছে, তারপর জামায় লাগিয়েছে ঝোলের দাগ। হঠাৎ ভারি চোখ জোড়া মেলে তাকিয়েই সুরঞ্জনকে কমলেশের কানে কানে কথা বলতে দেখে হেসে উঠল—আপনাদের টেণ্ডার পাস হচ্ছে না? বললাম পাহাড় জঙ্গলে চলুন, ঘরে বসে ফূর্তি হয়?

—শালা, তুই একটা লম্পট!

—ওল্ড হ্যাগার্ড! লম্পট আবার কি? বিছানায় নিয়ে শোব, এই তো!

—তুমি শালা সোনার চাঁদু! শোবে না শোয়াবে?

কমলেশ বলে—আবার টেণ্ডার, বিজনেস? ভালো লাগে না। লাইফের কোন এনজয়মেণ্ট নেই! আসুন এ সময়টা অন্তত আপনারা কাজের কথা ভুলুন!

—লাইফ বলে চেঁচালেই হয় না, লাইফটা বোঝা চাই।

—ফিলিমে বেশ আছেন। আমার মনে হয় আমরা সেক্সের দাস। সেক্স সম্বন্ধে কোন ট্যাবু থাকা উচিত নয়।

—ট্যাবু? না না মশাই ট্যাবু আমার নেই। এভরি নাইট আই নিড্ এ গার্ল!

বীরু চেঁচিয়ে উঠল—তুমি শালা হাড়কাটা, সোনাগাছি যাও, ছুঁক ছুঁক কর!

—কি আছে সেখানে? ওরা প্যাসান ফোটাতে পারে?

—তা বলবেন না, রাতে রেইড করিতো, কলকাতার অনেক চাঁদুই ধরা পড়ে। প্যাসান না হলে কিসের জন্য যায়?

—কি বললেন, ওর কনকুবাইন আছে? কোন লিডারের নেই?

—ওয়ার্ক হ্যাম্পার হবেই মশাই! ইস্টার্ন ইণ্ডিয়াকে স্যাবোটেজ করা হচ্ছে!

—মুতলি? ডিভানে সেই মুতে দিলি তুই বীরু? কে একজন চেঁচিয়ে উঠল।

কমলেশকে নিয়ে সুরঞ্জন তখন চারতলার ছাদের উপর চলে এসেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, আকাশ তারা নক্ষত্রে পোকায় কাটা। অস্পষ্ট ধোঁয়াশার মধ্যেই নগরের অনন্ত শূন্য আজ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। এক কোণে সম্ভবত টালিগঞ্জের দিকে ফিকে চাঁদ উঠেছে। লিপস্টিক ধোয়া সকালের বাসি মেয়েলি ঠোঁটের মত। জানালা শার্সিতে অসংখ্য আলো যেন জোনাকি হয়ে জ্বলছে। নীচে গাড়ি ঘোড়ার হর্ণ, কুহেলিকার মত চারতলার খোলা ছাদে এ দু-জনার কানে বাজছে। উঁচুতে উঠলে সবকিছুই সুন্দর লাগে!

কমলেশ বলে—এখানে ডাকলি কেন? ওরা কিছু মনে করবে না?

সুরঞ্জন বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞেস করল—তোদের ঐ বাড়িটা সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিলি?

—কোন বাড়ি?

—কাকুলিয়ার!

—হঠাৎ? এ কথা তো ওদের সামনেই বলতে পারতিস?

—না, না, পার্সোনাল, তোর আমার মধ্যে কথা! তাছাড়া ওরা এখন অন্য মুডে।

কমলেশ সিগেরেট ধরায়। স্নেহের দৃষ্টিতে দূর দালান-কোঠার দিকে চোখের পাতাজোড়া মেলে দেয়। ক্যালকাটা! ও ক্যালকাটা! ওর মনের ভাব এখন এমনই।

—বাঃ চারমিং! কি ছিলো আর কি হোলো!

—বললি না তো?

—কি বলবো? জয়সোয়ালকেই দেব। তিন লাখ দর দিয়েছে। কমলেশ খুক খুক কাসতে থাকে, মনে হয় ভুঁড়িটা কাঁপছে তার।

চশমার কাঁচে পাশের উঁচু দালানের জানালার আলোকোজ্জ্বল ফ্রেমের ছায়াটা এসে পড়েছে, তারই মাঝে কমলেশের জ্বলন্ত সিগেরেটের সিঁদুর টিপটি মাঝে মাঝে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। কমলেশ হাসতে হাসতে বলে, —জমি আর বাড়ি বেচবো বলে সেলামি হিসেবে ব্যাটার কাছ থেকে কম মদ খেয়েছি? কোন বার বাদ নেই। ভাবছি কদিনের জন্য ওর পয়সায় কনটিনেণ্ট ঘুরে আসব।

—শুধু তাই? শুনলাম ওকে ধরে তুই নতুন বিজনেস খুলবি?

—কে বললো?

—যেই বলুক না কেন!

—মোটামুটি তাই···তা হঠাৎ কাকুলিয়ার বাড়িটার কথা কেন?

সুরঞ্জন খানিক চুপ করে থাকে। কি ভাবে শুরু করবে ভাবতে পারছে না। কমলেশের প্যাকেট থেকে একটা সিগেরেট ধরিয়ে আকাশে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে—মাস্টারমশাই, মানে আদিনাথ বাবুদের কি হবে? ···কল্যাণী বলছিল···

—আজকাল কল্যাণীকে নিয়ে পড়েছ? বেশ আছিস, মাইরি!

—কমলেশ! সুরঞ্জন ধমক দিয়ে ওঠে। কমলেশ থমকে তাকিয়ে পড়ে। সুরঞ্জন বলে, সরি! কমলেশ দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখে চাঁদ-ওঠা টালিগঞ্জের দিকে। মনে হয় সুরঞ্জনের ধমকটা তার কানেই যায় নি! আবার একটা সিগেরেট্ ধরাল কমলেশ, মুঠি করে টানতে টানতে বলে—কলকাতা পাল্টে গেল! ফাইন! মাঝে কোন টুরিষ্টই আসতো না! City of violance and decadance!

—বাড়িটা সারাবি না? মিনিমাম প্রোটেকশন না থাকলে মানুষ কটা থাকবে কি করে? কি ভাবে হেলে পড়েছে দেখেছিস?

—ড্যাম ইট। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যেতে দে। জয়শোয়াল বুঝবে।

—বলছিলাম মাস্টারমশাইয়ের কথা!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি করব তার?

—তোর কিছু করার নেই? তিরিশ বছর বাসাটা আগলে রাখল, এখন এ কথা বলছিস?

কমলেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। চশমাটা খুলে রুমালে মুছতে মুছতে ফের চোখে চাপিয়ে বলে—আমার লাষ্ট অফার ছিল দু হাজার টাকা। বলেছিলাম দু হাজার টাকা দিচ্ছি উঠে যান। কলকাতার বাইরে যে কোন জায়গায় ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারে!

—না! ইচ্ছে করলেই পারে না। এতদিন শহরে থাকার হ্যাবিট গ্রো করে গেছে। অনেক ফেসিলিটি আছে এখানে। মাস্টারমশাই ওল্ড হয়েছে এই ফেসিলিটিতে. এখন কি কলকাতার বাইরে নড়া সম্ভব?

—তুই বোঝা তাহলে।

—আমি বোঝালেই বুঝবে? আমার পার্টনার হয়ে তুই বুঝিস?

—কি বুঝি না?

—তিরিশ বত্রিশ বছর ধরে এলাকা আকড়ে রইল, এখন মওকা পেয়ে ও-কথা বললে চলে? পার্টিশানের পর কলকাতাকে ওরা নিজেদের ঠিকানা বলেই ধরে নিয়েছিল।

—ভেরি গুড্। তা যদি বলিস, আমরাও তো এতদিন কিছু বলি'ন। তিরিশটি টাকা, তাও রেণ্টকণ্ট্রোলে পাঠাচ্ছেন। ঠিকানা ফিকানার কথা বলিস না, ভাবলেই ঠিকানা হয় না, এলেম থাকা চাই। ও সব সেণ্টিমেণ্ট দিয়ে কথা বলিস না। এটা সেণ্টিমেণ্টের যুগ না। আর এটাকে মওকা বলছিস কেন?

—ভেবে বলিনি।

কমলেশের গলাটা হঠাৎ নরম হয়ে আসে। একদলা আবেগ যেন কণ্ঠনালীতে আটকা পড়ে গেছে।

—তুই বল সুরঞ্জন, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক আর মেট্রোরেলের কল্যাণে ভাই, ও অঞ্চলটা কলকাতার পশ্ এলাকা। জমির দাম শুনলি? এ দাঁও মারাটা কি অন্যায়? ওনারও বোঝা উচিত এটা।

—বুঝলেও ওনাদের কিছু করার নেই এখন।

কমলেশ বিরক্ত হয়ে বলে—ডিসিসন্ ফাইনাল। ওটা বিক্রী হবেই। অনেকদিন ওনারা আছেন বলেই দু হাজার টাকা অফার

করেছিলাম, রাজি হলেন না। ওনারা কি ভাবছেন আইন দিয়ে ঠেকাবেন? ইচ্ছে করলে দু দিনে রাস্তায় নামিয়ে দিতে পারি। জয়শোয়াল তো বলেছেই, ভাড়াটে সুদ্ধ কিনতে সে রাজি। ঝামেলা সে পোয়াবে।

—আমি সে কথা বলছি না।

—তবে?

—নিশ্চয়ই কালই জমিটা বেচছিস না। মেট্রোরেল কম্‌প্লিট না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবি? তিনলাখ তখন পাঁচলাখে উঠবে।

—ইয়েস্! সে চেষ্টা আমি করবই।

—তাই বলছিলাম, সে ক'টা দিন···অন্তত বাসাটা একটু সারিয়ে-সুরিয়ে দে।

—পথে এস। বেশ তো, টাইম চাচ্ছিস? হ্যাঁ, মেট্রোরেল কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব, তা পাঁচ দশ বছর যাই লাগুক না কেন! ওনাকে এটুকু দয়া আমি করতে পারি।

—দয়া? সুরঞ্জন কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বলা হয়ে উঠল না তার। কমলেশই বলল—হ্যাঁ, আদিনাথবাবু ওটা ঘৃণা করেন, জানি।

—কি করে জানলি?

—সেদিন বাড়িতে এসে বাবাকে তাই বলে গেলেন। জানিস তো বাবা রাশভারি লোক? ঠিক আমার মতই! কি প্রসঙ্গে দয়া কথাটা উচ্চারণ করতেই উনি বোতল ভাঙ্গা কাঁচের মত হেসে বলে-ছিলেন, 'প্রফুল্ল আপনার পার্টনার, আমার এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ও জানে দয়া শব্দটা আমি সবার মুখে শুনতে চাই না।'

—বুড়ো এসেছিল কেন?

—ফাটা ছাদ আর বাথরুম সারিয়ে দেয়ার জন্য।

—তা মেশোমশাই কি বলল?

—চুপচাপ শুনে গেলেন। বোঝাতে চাইলেন। সে কি আর শোনে? কি বলব মাইরি তোকে, টিপটিপ বৃষ্টি বাইরে, লোড শেডিং,

পুরু চশমা নিয়ে বুড়ো নেমে গেল! বাবা এত করে বললেন গাড়ি করে পৌঁছে দেই! বুড়ো হেসে বলে, ধন্যবাদ! এক মিনিট দাঁড়াল না! এ তো বাড়িতে এসে রীতিমত অপমান করা! না, না, ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাক্ ও বাড়ি! আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। তবে হ্যাঁ, সারিয়ে আমি দিতে পারি, কিন্তু।

—কিন্তু? কিন্তু কি শর্তে?

—মিনিমাম তিনশো টাকা ভাড়া দিতে হবে। রাজি করাও, কালই সারিয়ে দেব আমি! কাকুলিয়ায় অর্ডিনারি বাড়ির নতুন ভাড়া এখন পাঁচ-ছ শো টাকা!

হঠাৎ পিছন তাকিয়ে শোনে উদাত্ত কণ্ঠ—এ আকাশ, অনন্ত বীথি/ তারা-দীপ, নক্ষত্রেরা ছিল/ তন্তুজ সময়ের জালে-/ তোমার গর্বিতা বুক/হেমন্তের কবোষ্ণ কুহকে—হে নারী!

বীরু বলে উঠল—তোমরা অশ্লীল কাজে লিপ্ত?

পুলিশ-অফিসারটি হাসে।

কমলেশ বলে—কি হচ্ছে বীরু?

—ন্যাকা! তোর সোডোসির দোষ নেই বলতে চাস?

ওরা তিনতলার দরজার কাছে নেমে আসে। সুরঞ্জন বলে—আমি চলি আজ। গুড নাইট!

বীরু বলে—সে কি মশাই? আপনি তো বড় বেরসিক!

—প্লিজ, শরীরটা খুব খারাপ, বুকে একটা পেইন হচ্ছে।

৭

প্রিয়নাথের উপস্থিতিতেই খোকা মঞ্জুর উপর সেদিন হাঁকিয়ে উঠল—ভেঙ্গে ফেলবো সব, লজ্জা করে না? বেড়াতে যেতে দিয়েছিলে আমায়? মঞ্জু বলে,—একশ টাকা দিয়ে?

—হ্যাঁ, একশ টাকা দিয়ে! ক্লাসের সবাই গেছে, আমার লজ্জা লাগে না বুঝি?

—চোখ রাঙ্গাবি না, এই শিক্ষা হচ্ছে তোর?

—সব কিছুতেই এটা করবি না, ওটা করবি না। দেখো আমার বন্ধুদের! —বন্ধু? কে তোর বন্ধু? দিন রাত দূর দূর করে, আবার বন্ধু? বাসায় এসে যত চোট-পাট?

—করবই তো। তোমরা বলতে পার? টুকাই যখন আমায় অপমান করে দাদু কিছু বলতে পারে? বাবা চুপ করে থাকে কেন? জ্ঞান দেয়া হচ্ছে। আমার যেমন খুশি চলব।

প্রিয়নাথ এ সময়টা বাসায় থাকে না। গ্যাসের উৎপাতে শরীরটা দুর্বল, শুয়ে ছিল সে।

—খোকা! প্রিয়নাথ আস্তে ডাক দেয়। অসম্ভব রেগে গেলে প্রিয়নাথের গলা স্তিমিত হয়ে যায়। হৈ চৈ করে না, কাটা কাটা দু চারটে কথা বলে তখন।

—কি হচ্ছিল রান্নাঘরে? স্কুলের সব ছাত্রই বেড়াতে গেছল?

—হ্যাঁ। শুধু দু জনের শরীর খারাপ ছিল আর আমি!

—মা তো বলল, টাকা ছিল না।

—তালে ও স্কুলে পড়তে পাঠাও কেন? আমি বাসায় থাকব। রুদ্ধ আবেগে কথা ক'টি বলে সে দড়াম করে কপাট খুলে বাসন মাজা পেয়ারা গাছটার গোড়ায় চোখের জল সামলে নিল।

প্রিয়নাথের কপালের রগটা ফুলছে। কাগজটা ফেলে রেখে

সোজা বসে ভুরু কুঁচকে রইল খানিক। কোথায়, কোথায় ওর দুঃখ? মুখের উপর এ ভাবে কথা বলার সাহস পেল কোথা থেকে? সামনের দেয়ালে টাঙ্গান ছোটবেলার ছবিটার দিকে তাকায়। ও কি নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করছে? ছোটবেলা থেকে খোকা খুব অভিমানী, সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন। প্রিয়নাথ ঠাণ্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করে। ওর সহপাঠী, পাড়ার দু চারটে বন্ধুরা কি দৃষ্টিতে দেখে? হয়ত অপমানিত হয়। তার ফলেই কি? ...তার মনে পড়ে দেশ বিভাগের পর তার বন্ধুদের সম্পর্কেও এমন একটা ধারণা জন্মে গেছল। তাদের হাসি, চাউনি, কথাবার্তার মধ্যে অহরহ প্রিয়নাথ অনুভব করত দেশটা আর ওদের নয়। মনে পড়ে, তার বন্ধু শামসের একদিন বিনা অনুমতিতেই ছিপ দিয়ে ওদের পুকুরে মাছ ধরল, ওকে দেখে হাসল এবং ছিপ আর মাছ দাওয়ায় রেখে বাবার পাশের চেয়ারে বসে কুশল জিজ্ঞাসা করেছিল। সে সব দিনে বাবার পাশে ও-ভাবে সরাসরি বসবার অধিকার সবার ছিল না। দৃশ্যটা দেখেই প্রিয়নাথের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল রি রি করে উঠেছিল। ভেবেছিল বাবার যা রাগ, এই মুহূর্তেই হয়তো খড়ম দিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে শামসেরকে তাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, প্রিয়নাথ লক্ষ্য করেছিল বাবা কিছু বললেন না। গুরুক্ গুরুক্ হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে শামসেরের অনেক কথার দু চারটে জবাব দিয়েছিলেন শুধু। কেমন ম্লান ভাবে তাকিয়ে ছিলেন শামসেরের চলে যাওয়ার দিকে। সেদিনের মানসিক অবস্থাটা প্রিয়নাথের আজও মনে পড়ে। সমস্ত বুকটা জুড়ে বাবার প্রতি তীব্র অভিমান ছড়িয়ে পড়েছিল। কেন সে কিছু বলল না শামসেরকে? কেন চুপ করে ছিল? সারা বিকেল অসহ্য গুমটের পর রাতে বাবার সামনে বলেছিল—আর এ দেশে থাকা যাবে না। বাবা ততোধিক মোলায়েম গলায় বলেছিলেন —কেন রে, বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে ছেড়ে কোথায় যাবো? প্রিয়নাথ সেদিন নিজেকে স্থির রাখতে পারে নি, যাঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস পেত না, সেই আদিনাথের সামনে রুদ্ধ আবেগে চেঁচিয়ে

উঠেছিল—আমি এক মুহূর্ত থাকব না! তোমরা যা খুশি করতে পার!

প্রিয়নাথ চশমা খুলে চোখটা মুছল। কেমন ঝাপসা লাগছিল তার। বাবা! —আস্তে ডাক দেয় সে। আদিনাথ এ ঘরে বালিশে কাত হয়ে একখানা পুরোনো বই পড়ছিলেন। এই বইটাই কাল জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারের বর্তমান বংশলতার কাছ থেকে কিনেছে। অনেক দিন পর এ সময়ে এখনও পাখাটা আছে, হাওয়া লাগছে। চা-টিও আজ বৌমা মন্দ বানায় নি। এ বয়সে টুক টুক করে সকাল থেকে কম পরিশ্রম করতে হয় না। দুধ আনে, পড়াতে যায়, টুক্, টাক দোকান করে, এখন মুক্তি। বইয়ের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে পারে। বই পড়া তার নেশা। প্রিয়নাথের প্রথম ডাকটা ও ঘরে শোনা যায়নি। প্রিয়নাথ ভাবল উল্টো, বাবা অভিমানে সাড়া দিচ্ছেন না। খোকার কথাবার্তা তিনিও শুনেছেন। এই সংসারে এ ভাবে কেউ কথা বলবে, সব কিছু অনুশাসন অস্বীকার করবে, আদিনাথ স্বপ্নেও ভাবেন না। তাদের জীবনের এই সায়াহ্নে, এত অভাব অনটনের মধ্যেই, এটুকুই গর্বস্থল যে বিশেষ এক আদর্শে তাঁর পরিবারটির মানসিকতা গড়ে তুলেছেন। কিন্তু খোকা?

—বাবা!

—এসো।

প্রিয়নাথ এ ঘরে ঢুকে সন্তর্পণে বইয়ের অলিগলি পেরিয়ে বসল। আদিনাথ উঠে বসেন। মা রান্নাঘরে মঞ্জুকে সাহায্য করছে। কল্যাণী বাড়ি নেই। সময় পেলেই টুকটাক বেরিয়ে পড়ে সে। আস্থা বা বিশ্বাস আছে বলেই বাসার কেউ বাধা দেয় না। তা ছাড়া সুবিমলের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কটা সবাই জানে। এই সব ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় আদিনাথ মাথা গলান না।

—বাবা, কিছু গোলমাল হচ্ছে মনে হয়।

—কিসের?

—একটু আগে সব শুনেছেন নিশ্চয়?

আদিনাথ চশমা খুলে হাসতে হাসতে বললেন—শুনেছি। অনেকদিন থেকে লক্ষ্যও করছি, তুমি দুঃখ পাবে বলে আমি বলিনি।

—কিন্তু এখন না দেখলে তো হচ্ছে না।

কাঁপা কাঁপা হাতে ফস্ করে আদিনাথ একটা বিড়ি ধরান, পেজ-মার্ক দিয়ে বইটা রেখে দেন তাকে। দূরবীনের মত তাকান জং-ধরা জানলার ফাঁকে। শেওলা ধরা স্যাঁত স্যাঁতে পুরোনো দেয়ালটা দেখা যায়, পাশের বাড়ি থেকে কুকুরের মলমূত্র ত্যাগ করানো হয় ওখানে।

আদিনাথের চোখজোড়া বড় বড় লাগছে, ভারি চোখের পাতা কাঁপছে থির থির করে। মনে হয় মৃদু হাসছে সে প্রকৃতপক্ষে তিনি হাসছিলেন না। কি যেন খুঁজছেন, মনে করবার চেষ্টা করছেন।

—একবার স্কুলে গিয়ে খোঁজ নেবেন?

—লাভ নেই।

—কেন?

— আমার মনে হয় এ পরিবেশে ও নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে না। পাবার কথাও নয়। সাতচল্লিশের পর আমাদের যা হয়েছিল।

—সাতচল্লিশ? সে তো কবে কেটে গেছে?

—হ্যাঁ, রক্তারক্তি দাঙ্গা নেই বটে নিঃশব্দে একটা সাতচল্লিশ চলছে। লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না, কলকাতায় জীবনযাত্রার সীমা-রেখা দেশ ভাগের মতোই প্রতিদিন ঠেলে দিচ্ছে। ওর বন্ধুদের সঙ্গে মিশবে কি করে?

—বাসায় থাকুক। মেশবার দরকার নেই।

—বুঝলে, এখানে বসে অনেক রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপটা দেখলাম, সয়েও গেছে এখন, কিন্তু···

প্রিয়নাথ চুপ করে রইল, বাবার মুখের ঐ থেমে থাকা 'কিন্তুটি' প্রিয়নাথকে চুপ করিয়ে রাখে। অনেক কিছু সমস্যা নিয়ে অনেক বড় বড় কথা ভাবে সে, এবার নিজের পরিবার, ভবিষ্যতের ব্যাপারে কেমন থমকে রইল।

আদিনাথ বলেন—ও আমাদের কাছে প্রতিবাদ চেয়েছিল।

প্রিয়নাথ কথা বলে না।

—ওর এই পরিবেশ অপমানের। পাগল! সে কি করে সম্ভব একলা আমাদের পক্ষে? মনে হয় ভুলটা আমারই।

—কিসের?

—এসব কোনদিন ভাবিনি আমি। ভেবেছিলাম দেশে সব খুইয়ে এসে এটাই নতুন ঠিকানা হবে আমাদের। দেখছি প্রফুল্লটাই ঠিক।

—রাখুন আপনার প্রফুল্লর কথা। সেলফিস হলে ও রকম অনেক কিছুই করা যায়।

—আজকাল দেখছি ওটাই সব। শিক্ষা-দীক্ষা সুযোগ সুবিধা সব কিছুর লক্ষ্যই দেখছি সেলফ্। নিজের জন্য, নিজেকে নিয়ে।

—না, না একথা আপনার মানি না। একপেশে বিশ্লেষণ।

—হতে পারে! তবে মনে হয় ভাঙ্গা, জীর্ণ কিছু সময়ের মুখোমুখি আমরা। এসব চাকচিক্য, রাস্তাঘাট, মেট্রো তারই রেজাল্ট। আমরা কেবল তার দর্শক। পিতা পুত্র চুপ করে রইল, কুলুঙ্গিতে ঘড়িটা বাজছে টিক্‌টিক্ করে।

মঞ্জু এসে বলে—চা যদি দরকার হয় এখন বল, উনুনের আঁচ ফেলে দিচ্ছি। কাগজ জ্বালিয়ে পারব না কিন্তু।

—খোকা কি করছে?

—কি আর করবে? রাস্তার দিকে গেছে।

—চা? মন্দ কি! বানাও।

কল্যাণী ঘরে ঢোকে। বেশ হাসি হাসি লাগছে তাকে। ফিকে নীল রংয়ের শাড়ি, সাদা ব্লাউজ।

—অর্ডার দিয়ে এলাম! যাক্! খোকা কৈ?

—কিসের অর্ডার?

—ওর স্কুল-ড্রেসের। তুইও পারিস! সত্যিই ওসব জামা-কাপড় পরে কেউ? ওদের স্কুল এ ব্যাপারে টিপ্‌টপ্।

—টাকা পেলি কোথায়?

কল্যাণী হাসতে হাসতে বলে—কেন আমি টাকা যোগাড় করতে পারি না?

—ফাজলামো রাখ।

—বৌদি আমায় এট্টু চা দিও। পাউডারের কৌটোয় কত জমিয়েছিলাম জানিস?

—ওভাবে খরচ করলি? আবার তো সামনে পুজো আসছে, তখন?

—যাঃ! সত্যিই সব ছেলেরা ওকে খেপায়। শুধু বললেই তো হয় না! ও হ্যাঁ, শীতলদা তোমার কথা জিজ্ঞেস করল।

—ওখানে গেছলি কেন?

—যাব কেন। ফুট দিয়ে আসতে দেখা হল তাই! তোমার জন্য অনেকে নাকি অপেক্ষা করছে।

প্রিয়নাথ উঠে রান্নাঘরে একবার যায়। মা মঞ্জুকে বলছে—আমার গরম জলটা চাপিয়েছ? মঞ্জু একগাদা জামা কাপড়ে সাবান ঘষতে ঘষতে বলে—আঁচতো ফেলিনি, কল্যাণীকে বলুন। প্রিয়নাথ লক্ষ্য করে মঞ্জু মাঝে মাঝেই পাশের বাড়ির দোতলার জানলায় তাকায় আর বিরক্তিতে গজগজ করে।

প্রিয়নাথ ভাবল একবার বেরোনো দরকার। দাশকেবিনে নয়, তিলজলার দিকে। কাগজে যাত্রার বিজ্ঞাপন দুটোর পেমেণ্ট পাওয়া যায়নি। সুধীর দেখাও করছে না। সুধীরই বিজ্ঞাপন দুটো এনে দিয়েছিল। সুধীর চাকরি করে না, বলতে গেলে বেকার। সুধীরের সঙ্গে একসঙ্গে প্রিয়নাথ ছাত্র আন্দোলন করত। সুধীর ভালো গণ-সঙ্গীত গায়। গান গাইতে পারে, সুর দেয়। তবু সুধীর জীবনে দাঁড়াতে পারেনি। একটু বোহেমিয়ান চরিত্র তার। এই আছে, এই উধাও হয়ে বাংলাদেশের গ্রাম গ্রামান্তরে কাটিয়ে দিয়ে আসে। বুড়ো বয়সে বিয়ে করে সংসার পেতেছে, তবু ঘরমুখো নয়। প্রিয়নাথের কাছে সুধীর মাঝে মাঝে আসে। একটা আয়ের উপায় খুঁজতে প্রিয়নাথ বলেছিল—সারাজীবন ঘুরে ঘুরে কাটালে, অনেক

কানেকশনও আছে। বিজ্ঞাপন যোগাড় কর, কমিশন নাও।

—বিজ্ঞাপন কে দেবে ?

—কেন যাত্রাপার্টি বিজ্ঞাপন দেয়, তোমার সঙ্গে পুরোনো বন্ধুত্ব আছে অনেকের, আমার কাগজেই কমিশনের ব্যবস্থা করে দেব। সুধীর এনেও ছিল দুটো, কিন্তু পেমেণ্ট দেয়নি। সুধীরের দোষই হল দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। প্রিয়নাথের রাগ হয়। এ জন্যই শালার কিছু হলো না। ভূধরবাবু এখন রোজ তাগাদা দিচ্ছেন। তাই ঠিক করল একবার সুধীরকে ধরা দরকার। জামাটা গলিয়ে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সুধীরের খোঁজে তিলজলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল প্রিয়নাথ।

কিছুদিন পর হঠাৎই বাসায় মঞ্জু, কল্যাণী এবং আদিনাথকে ঘিরে বিশ্রী বাক্‌বিতণ্ডা হয়ে গেল।

প্রিয়নাথ বাসায় ছিল না। ভূধরবাবুর কাগজটাকে বহুল প্রচার করার জন্য প্রায় দু বেলাই প্রিয়নাথ কাগজের অফিসে যায়। ভূধরবাবু সমস্ত ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে প্রিয়নাথের ওপর। কোন ব্যাপারে কেউ এলেই বলে—প্রিয়দাকে জিজ্ঞেস করুন। কোন খবর আমি রাখি না। প্রিয়নাথ কাগজটার লে-আউটটাই পাল্টে দিয়েছে। নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির যে কোন খবর ছাপিয়ে দেয়। এককালে প্রাচীনপন্থী বলে কাগজটার দুর্নাম ছিল। প্রিয়নাথ ভূধর বাবুকে বলেছিল—আমি কিন্তু এ ভাবে নিউজ দেব। না হলে কাগজ জমে না।

—আমার কোন আপত্তি নেই। কাগজের সার্কুলেশন বাড়লে আপনাদের বেতনও বাড়িয়ে দেব। আমারও হবে কিছু। প্রিয়নাথ দারুণ উৎসাহে সকাল সন্ধ্যা দু বেলাই হাজির হয়। দাস কেবিনে বিশেষ যেতে পারে না। আজকাল অনেকেই কেবিনে এসে ফিরে যায়, কেউ কেউ পত্রিকা অফিস পর্যন্ত ধাওয়া করে। তথাগত তার পারিবারিক সমস্যা নিয়ে সকালের দিকে প্রিয়নাথের সঙ্গে কাগজের অফিসে গল্পগুজব করে। সকাল দশটা থেকে বারোটা-একটা মোটা-

মুটি ফাঁকা থাকে প্রিয়নাথ, বিকেলের দিকটা কাজের চাপ বেশি।

আজ প্রিয়নাথের অনুপস্থিতিতেই, এই ভাঙ্গা হেলে পড়া বাসার মানুষদের পুঞ্জীভূত মান অভিমান দুঃখ পরস্পরের ঠোকাঠুকিতে ফেটে পড়ে। কল্যাণী গিয়েছিল খোকার স্কুলে। এ সব ব্যাপারে আদিনাথই যাতায়াত করতেন প্রথম প্রথম। কিন্তু বৃদ্ধকে নিয়ে মুশকিল। রাস্তাঘাট, ট্রামবাস, স্কুল দোকান—যেখানেই যান, সামান্য পান থেকে চুণ খসলেই ঝগড়া বাধিয়ে দেন। মেজাজ যেমন খিটখিটে হচ্ছে, কোন কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারেন না। মঞ্জু এখন খোকার স্কুলে আদিনাথকে পাঠায় না। খোকাও দাদুর সঙ্গে এক পা রাস্তায় বেরোতে নারাজ। শূন্যে লাঠি নাড়িয়ে, দুর্ব্বীনের মতো চোখ করে এমন কাণ্ড বাধিয়ে তোলেন, খোকার লজ্জা লাগে। আজকাল বাসায় মঞ্জু চুপিচুপি কল্যাণীকে বলে সমস্যা, বুড়োর কানে গেলেই বলেন, কি বউমা? ও পারবে না, আমি যাব। মঞ্জু কিছু না বললেও কল্যাণী বলে—কোথায় যাবে তুমি? আমি সেরে এসেছি।

—তোরা কেন আমায় বলতে পারিস না? বেনিয়মটা ভেঙ্গে দিতাম।

—খুব হয়েছে। কমলেশবাবুর বাড়িতে দু কথা শুনিয়ে যে এল, কি লাভ হয়েছিল? সারিয়েছে কিছু?

—তবু শুনিয়ে দিয়েছি। অপমান বোধ থাকলে সারিয়ে দিতেন। পয়সাটাই বড় কথা নয়, মান অপমানবোধ যদি না থাকে!

এবার মঞ্জু কল্যাণীকে কলতলায় একান্তে ডেকে খোকার সমস্যাটা বলল। স্কুল থেকে অভিভাবককে দেখা করতে বলেছে। খারাপ আচরণের কিছু নালিশ আছে ওর বিরুদ্ধে। চিঠিটা প্রথম হাতে পেয়ে মঞ্জু ভেবেছিল প্রিয়নাথকেই দেখাবে, কিন্তু বেশ কিছু ভেবে সিদ্ধান্তে এসেছিল চিঠি পেয়ে প্রিয়নাথ খুব দুঃখ পাবে। সারাদিন হাজার কাজ নিয়ে ব্যস্ত, এরপর ছেলের চিন্তা ঢুকলে দিশেহারা হয়ে যায়। এই তো সেদিন মায়ের মুখে মুখে তর্ক করায় স্বামী-শ্বশুর কতটা দুশ্চিন্তায় মুখোমুখি চুপচাপ বসেছিল। এই চিঠি পেয়ে, রেগে

প্রিয়নাথ খোকাকে যদি চড়-চাপড় দিয়ে দেয়, কি হবে কে জানে। এখনও খোকার কাছ থেকে যেটুকু সম্মান, সম্ভ্রম আদায় করা হয়, তা যদি উল্টো প্রতিক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়? মঞ্জু বোঝে বখে-যাওয়া ছেলের মায়ের যন্ত্রণা। কাছাকাছি এক পরিবার—চলে গেছে এখন—প্রায়ই আদিনাথের বাসায় বেড়াতে আসত। বউটির সঙ্গে মঞ্জুর খুব ভাব ছিল। এখনকার হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অবস্থা নয়, তখন আদিনাথকে চেনা-জানার লোক কম ছিল না। সেই বউটির একমাত্র ছেলে বখে গেছল। বউটি খুব কাঁদত মঞ্জুর সামনে

চিঠির ভারটা নিজেই এতদিন বহন করে, আজ কল্যাণীকে বলতে সে অনিচ্ছায় বলল—আমায় যেতে হবে?

—আর কাকে পাঠাবো বল?

—ওর টিফিনের ব্যাপারে গিয়ে দেখলাম তো, পাত্তাই দিতে চায় না। কথা বলার আর্টই আলাদা! এ ব্যাপারে আমার গেলে চলবে কিছু?

মঞ্জু ভয়ে ভয়ে ফিস ফিস করে—তুমি না গেলে, শ্বশুরমশাই তো জানতে পারলে সারা বাসা মাথায় তুলবেন। মঞ্জুর চোখ মুখ করুণ লাগে। এক দিকে পুত্র স্নেহ, বিপরীতে ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা। মঞ্জুও জানে এসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে অভিভাবকদের সরাসরি যোগাযোগ করা উচিত। তবু সব সত্যকেই সরাসরি গ্রহণ করা যায় না। কল্যাণী একটু বিরক্তই হয়। এ বাসার ভারি মজা হয়েছে, সবকিছুই তার ঘাড়ে এসে পড়ছে। ঘাড় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম।

—কেন, দাদা যাক না!

—ও মানুষটাকে আর কষ্ট দিতে চাই না। গেলে তো দুটো তেতো কথা শুনবে! কি যে করি! আমার হয়েছে মরণ!

—একদিন তো জানবেই!

—বেশ, তালে আমিই যাব। মঞ্জু বারান্দার দিকে পা বাড়ায়। কল্যাণী ধরতে পারে বৌদি রাগ করেছে। সত্যি, পৃথিবীটাই এমন, অনুরোধ যখনই রাখবে না তখনই রাগ! এই যে টিফিন, স্কুলের

পোষাক নিয়ে ঝক্কি পোয়াতে হচ্ছে, সে বেলা মনে থাকে না।

—তুমি আবার কবে গেছ? ন্যাকামি করছ কেন, রাগ করি আর যাই করি, গেলে আমিই যাব।

—কোথায়? কোথায় রে? আদিনাথ জিজ্ঞেস করেন। শেষের কথাগুলো কল্যাণী একটু জোরেই বলে ফেলেছিল। মেজাজটা ঠিক ছিল না। বাবার আওয়াজে সম্বিত ফিরে বলে—কোথাও না। তুমি না বই পড়ছিলে? সব দিকে কান?

—তোরা দিনরাত চ্যাঁচাবি, বই পড়া বাধা পায় না?

কল্যাণী কথা বাড়ায় না। বাইরে যাওয়ার শাড়ি পরে, ছোট্ট ব্যাগটা খুলে খুচরো পয়সা কটা দেখে বেরিয়ে পড়ল। খোকা আগেই স্কুলে চলে গেছে।

স্কুল পৌঁছে শুনল এক্ষুনি ছুটি হয়ে যাবে স্কুলের এক প্রাক্তন শিক্ষকের মৃত্যুর খবর এইমাত্র পৌঁছলে, ছুটির নির্দেশ আসে। হেডমাস্টারমশাই কালো বর্ডারে নোটিশখাতা দিয়ে ক্লাসে ক্লাসে বেয়ারা পাঠিয়ে দিয়েছেন। কল্যাণী ঠিক তখনই ঢুকেছিল। দেখে সারা অফিসঘরটা নীচু ক্লাসের ছেলেদের ভীড়ে গিস্‌গিস্‌ করছে। যেন ফুল ফুটে আছে। এক ভদ্রলোক প্রতিটি ছেলের কাছ থেকে নাম এবং বাড়ির ফোননম্বর নিয়ে ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে ঘেমে যাচ্ছে। কাছের এক্সচেঞ্জে প্রায় হয়তো দশবার চেষ্টায় লাইন পাচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের খবর জানিয়ে দিচ্ছে ছেলেদের নিয়ে যাবার জন্য। হঠাৎ ছুটি হয়ে গেলে এ ব্যবস্থাই করা হয়। যারা স্কুলের গাড়িতে আসে, কোন অসুবিধে নেই তাদের নিয়ে। কিন্তু যাদের অভিভাবক আসে, তাদেরকে নিয়েই সমস্যা। আর কলকাতার পথে এভাবে ছেলেদের ছেড়ে দেয়া যায় না। কল্যাণী করিডোরের একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ টুকাই দেখতে পেয়ে বলে—কল্যাণীদি! খোকাকে নিতে এসেছ? কল্যাণী বলে—হ্যাঁ, ও কোথায় রে? বলতে বলতেই খোকা এসে হাজির। খোকা বুঝতে পেরেছে কেন কল্যাণী দাঁড়িয়ে আছে এখানে। সে উচ্ছ্বাস প্রকাশ

করল না। টুকাই বলে—আমিতো গাড়িতে যাব। ফোননাম্বার দিয়ে কি হবে বল? কেউ কথা বলে না। খোকাকে দেখে টুকাই হাসতে হাসতে বলে—

—দাঁড়া, স্যারদের একটু খাটাই। ফোন নম্বরটা দিয়েই আসি।

—ক্যান, তুই তো গাড়িতে যাবি?

—তবুও, কষ্ট করে রিং করুক না। তোরা কি এখুনি চলে যাবি?

কল্যাণী বলে—তুমি যাও আমাদের একটু কাজ আছে। কি খেয়াল হতেই টুকাই বড় বড় চোখ করে খোকার দিকে তাকায়। খোকার বুকটা ধরাস করে ওঠে। টুকাই বোধ হয় ধরে ফেলেছে। টুকাই হাসতে হাসতে বলে—স্যারের চিঠির জন্য? যাক্, আমি ফোন নম্বরটা দিয়ে আসি।

কল্যাণী বিরক্ত হয়ে বলে—হ্যাঁ যাও।

এ সমস্ত ঝামেলা মিটতে মিটতে ঘণ্টা খানেক কেটে গেল। অফিসঘর একটু ফাঁকা হতে কল্যাণী আস্তে ঢুকে শাড়িটা কাঁধের উপর ভালো করিয়ে জড়িয়ে সামনের চেয়ারে বসা ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করল—হেডমাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে একটু দেখা করা যাবে?

—কেন বলুন তো? উনি একটু ব্যস্ত! কল্যাণী সাত-পাঁচ ভেবে চিঠিটা বার করে দিতেই, উনি দেখে বললেন—শুধু এজন্য? আপনি এ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টারের সঙ্গে কথা বলুন।

—তার ঘরটা? ভদ্রলোক নির্দেশ দিতেই, কল্যাণী বেরিয়ে আসে। পিছন ফিরে দেখে খোকা দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

—আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

—তুমি যাও। আমি আছি এখানে।

—আয় বলছি? তোর সামনে কথা হবে। খোকা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এক কোণায় দাঁড়িয়ে থাকে। কল্যাণীর কোন আহ্বানকে সে ভ্রূক্ষেপ করে না। অগত্যা কল্যাণীকেই যেতে হল এ্যাসিসটেন্টের কাছে। চিঠিটা দিতেই সামনের চেয়ারে বসতে বলে কল্যাণীর মুখের

দিকে তাকিয়ে রইলেন—এর বাবা কোথায়? আপনি কে হন? কল্যাণীর উত্তর শুনে বলেন—এ সব ব্যাপারে বাবাই আসেন। হ্যাঁ, বুঝলাম, সময় কারই বা আছে কলকাতা শহরে, ওরই মধ্যে করে নিতে হয়। সবাই করে দিচ্ছে আর আপনার দাদা পারেন না? প্রবলেম তো আমাদের চাইতে আপনাদের বেশি। তাই না?

—আমি অস্বীকার করছি না স্যার। আমি সব গিয়ে রিপোর্ট করব। আমরা ওকে নিয়ে ভাবছি বাসায়।

—বাসা কোথায় আপনাদের?

—গড়িয়াহাটা।

—ওঃ খুব দূরে নয়। কিন্তু দেখুন, ওর স্টাডিতে ডিটোরিয়েশন হচ্ছে ম্যানার অত্যন্ত খারাপ, বিশেষ করে ছেলেদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভালো নয়। আফটার অল, এটা ডিসিপ্লিণ্ড স্কুল, নতুন করে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। এ ভাবে চললে আমরা তো টি, সি দিতে বাধ্য হব।

—কি আর বলব, বরাবর ও এমন ছিল না।

—সেই তো মুশকিল! ঘড়ি ভেঙ্গে ফেলেছিল একবার জানেন তো? আমরা চান্স দিলাম শুধরে নেয়ার। কিন্তু ক্লাশের মনিটারের রিপোর্ট, ছেলেদের সঙ্গে রুড বিহেভ করে। উইকলি টেষ্টগুলোতেও ভালো করছে না।

—হ্যাঁ, গত দুটো পরীক্ষায় অসুস্থ ছিল।

—প্রাইভেট কোচ্ দিচ্ছেন না?

—না বললে ভুল হবে, দাদুই পড়ান ওকে। তবে উনি তো আর্টসের লোক, সায়েন্সের নতুন কোর্স ওঁর জানা নেই। আর আপনার কাছে খোলাখুলি স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আজকাল টিউটর রাখতে আমাদের পক্ষে......। এ্যাসিসটেন্ট একটু বিস্ময়েই কল্যাণীর শাড়ি জুতো আড়চোখে লক্ষ্য করলেন।

—গড়িয়াহাটার কোন দিকে থাকেন?

—কাছেই, কাকুলিয়া।

—এর বাবা কি করেন ?

কল্যাণীর জবাবের পর এ্যাসিসটেন্টের গলার স্বর, কথাবার্তার ধরণই যেন কিছুটা পাল্টে গেল। এতক্ষণ, যাই হোক মিহি মুখোশ পরে কথা বলছিলেন। এবার উপদেশ দেয়ার ভঙ্গিতেই বলে—এ স্কুলে দিলেন কেন ? এডুকেশন ফ্রি যখন যে কোন অরডিনারি স্কুলে পাঠাতে পারতেন, আপনাদের মিনস্‌-এর মধ্যে থাকত !

—আমাদের বংশে ঐ একটিই ছেলে, বাবার ইচ্ছে পল্যুটেড না হয়ে যায়।

—কিন্তু তাই হয়ে যাচ্ছে এবং আমার স্কুলের আর দশটা ছেলেকে পল্যুটেড করে দিচ্ছে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনা, ওর মধ্যে জিঘাংসা বৃত্তি আছে ! কোন এ্যাডজাস্টমেণ্ট নেই। এখানে অনেক ভালো ঘরের ছেলে আছে, সে গার্ডিয়ানরাও তো আমাদের কাছে জবাবদিহি চাইতে পারে ?

কল্যাণী মরমে মরে জিজ্ঞেস করল—স্যার, যদি কোন ওর অফেন্সের কথা বলেন···

—পারটিকুলার অফেন্স ? আপনাকে কি বোঝালাম ? ওর বাবাকে পাঠিয়ে দেবেন··· ।

এ্যাসিসটেণ্ট চেয়ার ছেড়ে ওঠেন, কল্যাণীও। করুণ মুখটা দেখে এ্যাসিসটেণ্ট নরম গলায় বলেন—ছেলেটির মেরিট যে খারাপ তা নয়। এ্যাডজাস্ট করতে পারছে না। বেটার, অন্য স্কুলে নিয়ে যান। রেললাইনের ওপার-টোপারে কিছু স্কুল নেই ? আমি আপনাদের কথা ভেবেই বলছি।

কল্যাণী এতক্ষণ যাহোক হজম করছিল, এ্যাসিসটেণ্টের সহানুভূতির কথাগুলো হুলের মতো লাগল মনে হচ্ছে কোনদিন স্কুলে আর সে পা দিতে পারবে না। বৌদির উপর ভয়ানক রাগ হয়। কেন জোর করে কল্যাণীকে আপমানের আগুনে ঠেলে দেয়। তারপর খোকার গোয়ার্তুমি। ও সামনে থাকলে হয়তো দু-চারটে ধমক দিলেও একা কল্যাণীকে এ কথাগুলো শুনতে হত না।

—চলে এস! ধমক দিয়েই খোকাকে নিয়ে গেট পেরোয় সে। কল্যাণী লক্ষ্য করে ধমকটায় খোকা যেন আমলই দিল না। মাথা-নীচু করে একখণ্ড ইঁটকে ফুটবলের মতো শট্ করতে করতে এগোয়।

ওরা হেঁটে হেঁটে রাস্তার ফুট ধরে আসছিল। অফিস টাইম শেষ হয়নি এখনও, কলকাতার যানবাহনে পা দেয়ার উপায় নেই। গাঁক-গাঁক করে মিনি, ডাবল ডেকার ছুটছে গাদাগাদি হয়ে, এমন কি রুগী বৃদ্ধ নির্ঝঞ্ঝাট মানুষদের একমাত্র সম্বল .য ট্রাম তারও দরজাতে উপচে পড়ছে মানুষ। কল্যাণীর খুব জলপিপাসা পেয়েছিল, একটা থামস আপ্ খাবে? খুব ইচ্ছে তার। কিন্তু সাকুল্যে একটি বোতলেরই পয়সা আছে। খোকার উপর এমন রাগ বিতৃষ্ণা জম্মে আছে, ইচ্ছে করছে নিজেই কিনে খায়। দোকানে চেয়ে জল খাবে? অসম্ভব। আর হতে পারে মিষ্টির দেকোনে ঢুকে কিছু খেয়ে জল। বালিগঞ্জে আট আনার কমে মিষ্টি নেই অর্থাৎ কমপক্ষে একটি টাকা। আজ-কাল দোকানদাররা বোঝে জল খাওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে অর্ডার দিচ্ছে। বয়গুলো কেমন করুণার চোখে দেখে। এমন কি এলাকার খদ্দের, বিশেষত বউমেয়েরা হলে নীরবে কমুই গুঁতিয়ে হাসে। কল্যাণী ঠিক করল কষ্ট হলেও বাসায় গিয়েই খাওয়া যাবে। খোকা মাঝে দোকানের কাঁচের দিকে উঁকি মারছিল, এখনও লোভনীয় বস্তু হলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে; বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছিল ফিরে আসতে। প্রকাশ্য ফুটপাথে কি চেঁচান যায়? কল্যাণী মনে মনে ভাবে বাসায় চল, মজা দেখাব! খোকার চলার মধ্যে মনেই হচ্ছে না কল্যাণী সঙ্গে আছে, একাই যেন স্কুল থেকে হেঁটে আসছে বাসায়।

গোল পার্কের কাছে হঠাৎ স্কুটারটা রাস্তার সাইডে এসে ব্রেক কষল। কল্যাণী! —ছোট্ট ডাক দিতেই ফিরে দেখে সুবিমল। অবাক কাণ্ড! আচমকা এ ভাবে যে পথে দেখা হয়ে যাবে, পরস্পর কেউই কল্পনা করতে পারেনি।

—এই রোদে কোথায়?

—খোকার স্কুলে। ঐ যে হাঁদারাম পেছন পেছন! হঠাৎ ছুটি হলো—গিয়ে নিয়ে এলাম।

—আমার লাকটা ভালোই বলতে হবে।

—হেলমেট ছাড়া স্কুটারে উঠতে বারণ করেছি না। মাস্তানি হচ্ছে?

সুবিমল হাসে। – গার্জিয়ানি ফলানো হচ্ছে?

—কলকাতার যা অবস্থা, হেলমেট ছাড়া স্কুটারে ওঠা উচিত নয়।

—ঠিকই। হেলমেট ছাড়া উঠি না, তাড়াহুড়ায় নিতেই ভুলে গেলাম। চলো কোথাও একটু চা খাওয়া যাক্।

—চা? এত বেলায়? হাঁদারামটা?

—থাকুক না, ও অন্য কিছু খাবে!

খোকা কাছে আসতেই কল্যাণী বলে—চল, চায়ের দোকানে ঢুকব। খোকা কিছুক্ষণ সুবিমলের দিকে তাকায়, ফের কল্যাণীর দিকে। দোকানে ঢোকার প্রস্তাবে চোখে মুখে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। ভুরু দুটো বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

—কি, যাবি?

—দাঁড়াও, সিগেরেট নিয়ে আসি। সুবিমল এগিয়ে যায় একটা দোকানের সন্ধানে।

—অসভ্য! খুব পাকা হয়ে গেছ? কল্যাণী সুযোগ পেয়ে ধমক দেয়। চোখ বাঁকিয়ে খোকা বলে—আমি যাব না।

—কেন?

—তোমরা গল্প করবে আর আমি চুপচাপ বসে থাকব?

—খোকা?

—না, আমি যাব না। রাস্তাটা পেরিয়ে সে সোজা হাঁটতে থাকে। সুবিমল ফিরে এসে বলে—সে কি! ও যাবে না? একাই চলল যে?

—মুড! মুড না হলে ওকে দিয়ে কিছুই করান যায় না।

—যাক্, আমরাই বসি। ও একা চলে যেতে পারবে।

কল্যাণী তাকিয়ে দেখে খোকা রাস্তার মাঝে আইল্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে

আছে। গাড়ি ছুটছে দৈত্যের মত। ডাবল ডেকার, প্রাইভেট যাত্রী বোঝাই হয়ে বেরিয়ে যায়, খোকা চোখের আড়াল হয় মুহূর্তের জন্য। এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ায় কল্যাণীর সব কিছু তেতো লাগে।

—থাক্। চলে যাও, ইডিয়টটাকে না পৌঁছে দিয়ে শান্তি নেই।

—একা যেতে পারবে না ও ?

—জানি না।

সুবিমলের অবাক লাগে। বিরক্তও হয় একটু। এটা কল্যাণীর বাড়াবাড়ি, এতবড় ছেলেকে নিয়ে আদিখ্যেতা। সিগেরেট ধরিয়ে প্রথাগত ভাবে বলল—আচ্ছা। স্কুটারের দিকে দু পা এগিয়ে হঠৎ ঘুরে বলল—দাদা কমলেশের সঙ্গে কথা বলেছিল…। কল্যাণী বাকি অংশটুকু শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে চুপ কারে থাকে। সুবিমল কোন উত্তর না পেয়ে নীরস গলায় শেষটুকু বলে স্কুটারে ওঠে।

—পাঁচ দশ বছর দয়া করবে। মেট্রো কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত।

ফট্ ফট্ কর্কশ শব্দে স্কুটারটা এগিয়ে যায়। বাঁ-ডান দেখে কল্যাণী রাস্তা পার হয়, খোকার দিকে আড়চোখে তাকায়, একমনে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে।

বাসায় মঞ্জু কল্যাণীর ফিরে আসার অপেক্ষায় ভয়ানক বিরক্ত হচ্ছিল। ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে। যখন কল্যাণীকে অনুরোধ করেছিল যেতে, এমন ভাব করেছিল মেয়েটা বাসার বাইরে পা বাড়াতেও তার অনীহা এখন ? একবার বেরোতে পারলে আর বাসায় ঢোকার কথা মনে থাকে না। এর উপর, দু দিন মাথায় তেল দিতে পারছে না মঞ্জু। কৌটোটা ঠুকে ঠুকে শেষ তেলের ফোঁটাটি নিংড়ে নিয়েছিল। দু দিন মাথায় আগুন জ্বলছে। মাসের শেষে নতুন কৌটো কেনার সামর্থ্য নেই। গলির মোড়ে খুচরো বেচে না, শ্বশুরমশাইকে পাঠানো যেত তালে। এখন কাকুলিয়ার এ পাড়াটা বাবু এলাকা। চুল প্রসাধনের জন্য স্যাম্পু। ওয়েসিস এমনকি অনেকের বাড়ি চুল শুকোবার জন্য গ্রোভেল ব্যবহার করে। আর তেল যারা ব্যবহার করে, মাসে কৌটো শুদ্ধ কেনে। দোকানগুলোও

প্রয়োজন মতো সজ্জিত। খুচরো নারকোল তেল সেই গড়িয়াহাটের সব্জি বাজারের কোণায় একটি হিন্দুস্থানী মুদী-দোকানে পাওয়া যায়। এত বেলায় শ্বশুরকে পাঠাতে মঞ্জুর বাধ বাধ ঠেকছিল। কল্যাণী ফিরলে পাঠাবে ঠিক করেছিল। স্কুল থেকে ফিরতে এত দেরী? নিশ্চয়ই বাসার কাজ এড়াতে কল্যাণী ঘুরছে কোথাও। তবে প্রথমটা এত ন্যাকামো দেখালি কেন? মনে হচ্ছে সমস্ত দায় যেন মঞ্জুর। খোকা তার সন্তান বলে? বেশ, ভোর হতেই উনুনে ঢুকে বিকেলে যে মুক্তি পায়, শুধু কি নিজের জন্য? হাজার অনটনের সংসারে, একটু তেল মেখে শান্তিতে চানও করা যাবে না? কি নিয়ে বাসার সকলের এত অহংকার?

কল্যাণী ঢোকে এ সময়ে। খোকা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডুগডুগি বাজিয়ে বাঁদর খেলা চলছে, ছোটখাট ভীড়। খোকা সেই ভীড়ে ঢুকে আছে। কল্যাণী ঘরে ঢুকেই ফটাস্ করে ফ্যানের সুইস দিয়ে বোঝে লোডশেডিং। তাপের যন্ত্রণা বেশি করে এই মুহূর্তে অনুভূত হয়। টের পেয়েই মঞ্জু এসে বলে—কি, হল কিছু?

—আমায় আর পাঠাবে না।

—কেন, খোকাকে নিয়ে এলে যে? মঞ্জুর দৃষ্টি জানালায় যেতেই দূরে খোকাকে আস্তে আস্তে হেঁটে আসতে দেখে।

—জানি না।

—স্কুলে কিছু হোলো?

—হবার কি আছে?

—খোকা চলে এল যে?

কল্যাণী যত চুপ করে থাকে, মঞ্জুর ততই রাগ হয়। গিয়ে যেন মাথা কিনে ফেলেছে।

—অত করছ কেন? খুলে বলতে পারো না?

—কি বলব? সব কিছুরই সীমা আছে।

—সীমা আমার নেই? আমি কি করতে পারি, বলে দিতে পারো?

—আমি বলার কে ?

—এ বাড়িতে কারও কিছু বলার নেই, আমারই সব দায়, না? ঘর বার সব সামলাবো ? দুদিন ধরে একফোঁটা তেল মাথায় পড়ছে না, চৌহদ্দিতে খুচরো দোকান নেই, সেও আমায় ভাবতে হবে? চুলোয় যাক সব ! বেশ দৃপ্ত কণ্ঠে মঞ্জু কথা বলছিল। এ বাসার মানুষজন কোন দিন চেঁচিয়ে কথা বলে না। মঞ্জুর এই হঠাৎ বিস্ফোরণে আদিনাথ সচকিত। স্নান হয়ে গেছে তাঁর, খাওয়া হয়নি। মঞ্জু অনেকবার খেতে বলছিল, কল্যাণীর স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে একটু চিন্তিত মুখেই বলেছিলেন—থাক্, ফিরে আসুক ও, খবরটা শুনি। মঞ্জুর শেষ কথাগুলো তার কানে এসেছে। আস্তে আস্তে এ ঘরে উঠে এসে সহানুভূতির স্বরে বলেন—সত্যি ! কেমন পালটে গেল এলাকা ! আগে সন্ধ্যের পর লোক ঢুকত না। তখন তো বাবা আমরাই প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলাম, আর আজ আমাদের অবস্থা ! দেখতে দেখতে কি হয়ে গেল। এই বাজারে এক মুঠো নিমপাতা চার আনা। কি বলবে ! একেবারে অচেনা হয়ে গেলাম। এখানেই কি সস্তাগণ্ডায় দিন কাটিয়েছি।

মঞ্জু আজ এই প্রথম সোজা আদিনাথের মুখের উপর বলল—তবু তো নড়তে চাইছেন না। জগতে আর লোক বাস করছে না ? পুরোনো কথা ছেড়ে দিন। বাজারের কি দোষ ?

—আহাঃ গড়িয়াহাট বাজার হলো কবে ? তুমি ইতিহাস দেখ, লোকে বলত বালিগঞ্জ কা হাট। সপ্তাহে দুদিন হাট হতো, বৃহস্পতি আর রোববার।

—আপনার ওসব কথা রাখুন। যেমন সময় তেমন ভাবে মানিয়ে নিতে হয়।

আদিনাথ ক্ষুণ্ণ হলো, ভেতরে ভেতরে রাগও হল তার। এ বাড়িতে তার মুখের উপর এভাবে কথা বলার সাহস হয় নি। খুব বিচলিত বোধ করছিলেন তিনি। তবুও যথাসম্ভব হাসি হাসি করুণ মুখ করে বললেন—মানিয়ে নেয়া যায় ? মুখে বললেই হলো ?

—কেন, কে দিব্যি দিয়েছে ?

—আজ তিরিশ বছরের অভ্যেস। হাঁটতে পারি না, ভীড় সহ্য হয় না। এ আমি টুক করে দুধটা আনলাম, ট্রামে গিয়ে ট্যুশান সারলাম হয়ে গেলো। বই নিয়ে কাটাই, কোথায় যাবো, বলতো ? কে এই বুড়োকে ট্যুশনি দেবে ? খোকার স্কুলের খরচা, সংসার চলবে কি করে ?

—এতদিনে সে ভাবনা হলো ? তখন বোঝেন নি মানুষের মাথা গুঁজবার নিজস্ব পরিবেশ দরকার ? নগরের উন্নতি তো হবেই, স্ট্যাটাস বাড়বে, আপনার জন্য থমকে থাকবে কিছু ?

—না, তা বলিনি কোনদিন। পার্টিশানের পর আমরাই উন্নতির জন্য অনেক দরবার করেছি ! কিন্তু নগরের উন্নতি কি নাগরিকদের বাদ দিয়ে ? এতো মনে হচ্ছে নাগরিকদের ভাগাভাগি করে দেয়া হচ্ছে।

—পার্টিশান আজ হয়নি বাবা। আপনার মত কার অবস্থা ? এ বাসায় প্রফুল্লবাবুরাও ছিলেন, এ ভাবে ভুল তো করেনি ?

আদিনাথ আহত হয়। মনে হয় এই খর মধ্যাহ্নে সামান্য মঞ্জু তার সমস্ত জীবনের আদর্শস্থলকে নির্মম আঘাত দিয়েছে। হৃদয়ের গভীর ক্ষতে ঝরিয়েছে রক্ত। যে রক্তের লাল অস্পষ্ট দাগ তিনি তিরিশ বছর ধরে মুছবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। রক্তচাপটা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে কপালের রগগুলো কেঁচোর মত ফুলে উঠল। কপাল ঘামতে শুরু করেছে হঠাৎ। পুরু চশমার আড়ালে মস্ত ধূসর চোখ জোড়া ঈষৎ অশ্রুরেখায় থির থির কাঁপতে থাকে।

—ঠিকই বলেছো বৌমা, কি আর করবে কপাল বলেই মেনে নাও। প্রাণ হাতে কি করে এসেছিলাম, সংসার পালন করেছিলাম, সে দিনের সাক্ষী তুমি ছিলে না……।

মঞ্জুর হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে আসে। একি ! কি ভাবে আদিনাথের সঙ্গে কথা বলল সে ! বুকটা কেমন শুকিয়ে যেতে বাকরুদ্ধ হল তার।

আদিনাথ থামেন নি, বুকভরে বাতাস নিলেন।

—প্রিয় কিছু জানে···সে কথা তোমায় নতুন করে বলতে চাই না, ইচ্ছাও নেই। ভুল-ভ্রান্তি কে বা কারা করেছে, তা মহাকালই বিচার করবে। তবে···

মঞ্জু ভয়ে অসহ্য পরিবেশ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য একটা পা বাড়াল। মাথাটা নীচু হয়ে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। আদিনাথের কাঁপা গলা, স্ফীত রগ, বিন্দু বিন্দু ঘামের কপাল এবং পুরু চশমার আড়ালে মস্ত চোখজোড়ায় অস্বাভাবিক পলকে মঞ্জুর গলায় কি যেন দলা দলা আটকে যেতে চায়। আদিনাথের থুতনি এবং হাতের আঙ্গুলগুলো অসম্ভব কাঁপছিল।

—তবে একটা কথা শোনা দরকার। হ্যাঁ, শুনতে হবে তোমায়। আমি একটা আদর্শ নিয়ে জীবন ও পরিবার গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। কোন অবস্থায় হারতে চাইনি। চাইনি বলেই, নিঃস্ব একটি পরিবারের মেয়েকে ছেলের বউ করে এনেছিলাম নিছক শাখা-সিঁদুর পরিয়ে। তোমার বাপ বেঁচে থাকলে আজও স্বীকার করতেন ···

একটা ভয়ানক কথা! বিশেষ করে গৃহবধূদের জন্য। মঞ্জুর বুকে শেল বিঁধল। এরকম পরিস্থিতিতে আদিনাথের আবেগ ও অভিমান এমনভাবে যে ফিরে আসবে মঞ্জু কল্পনাই করতে পারেনি। মুহূর্তের জন্য গুম হয়ে গেল। কল্যাণী, নীরজা দেবী একটি কথাও বলছে না এমনকি খোকাও বিস্ময়ে মায়ের দিকে হাঁ করে আছে। বাইরে কার্নিশে একটা ক্লান্ত কাক ডাকছে, দীর্ঘলয়ে। থেকে থেকে সেই ডাক যেন মঞ্জুকেই ব্যাকুল করছে বেশি।

এই নাটকীয় পরিস্থিতিতে প্রিয়নাথ ঢুকে পড়ল এবং প্রিয়নাথকে দেখেই মঞ্জু আঁচল তুলল মুখে এবং সমস্ত দেহখানা তার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়তে চাইল। রুদ্ধ কান্নায় কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না।

—আমি আমার জন্য বলিনি বাবা! আপনারা যে যার নিজেকে নিয়ে আছেন! কেউ বই আড্ডা, চাকরি! আর আমি? আমরা

একটা ঝি পাই না, বেশি টাকায় পাশের বাড়িতে চলে যায়, সকাল সন্ধ্যা ভাঙ্গা ঘরটায় বাসন মাজি! জলে ভিজি! অবসরে একটু কথা বলার কেউ নেই, হাসতে ভুলে গেছি। দিন রাত প্রতিবেশীদের হুল, বাঁকা কথা। খোকাকে টেনে ধরে রাখতে হয়, মিশতে গেলে দূর দূর করে! ছোট্ট একরত্তি ছেলেটা সব বোঝে। ওর বন্ধুরা ওকে টিটকিরি দেয়। এ ভাবে দমবন্ধ হয়ে মরে থাকবার কি মানে? আমি আপনাকে আঘাত দিতে চাইনি বাবা! আপনার কপাল খারাপ হবে কেন, আমার ভাগ্যকেই দোষ দিচ্ছি!

অদ্ভুত নীরবতা! বাসার কেউ কারও সঙ্গে কথা বলল না। অদ্ভুত যন্ত্রের মতো যে যার কর্তব্য সেরে গেল। এই প্রথম প্রিয়নাথ গভীর ভাবে অনুভব করল কোথায় যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। খণ্ডিত স্বদেশের অভিশাপ ধূ ধূ তার মনে আছে, আজ এই নগর জীবনে শব্দ-হীন বিখণ্ডনে মনে হল এ পরিবেশে টিকে থাকার উপায় নেই। বেশ কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করছিল দ্বীপের মতো তাদের পরিবার এ আশ্রয়ে বাস করে তরঙ্গাঘাতের মতো নানান অর্থনৈতিক ঝড় ঝাপ্টা সহ্য করেছে। এর ফলেই নিঃশব্দে বেনো জল ঢুকে মূল্যবোধ এবং পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকেও কীটদষ্ট করে তুলেছে আর হয়তো টিকে থাকা যাবে না। মঞ্জু, বাবা মা এবং খোকা— প্রত্যেকের পর অসীম মমতা জন্মায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দোষারোপের বোঝা বা অসামর্থ্যের গুরুভার নিজের কাঁধে নেয়। হয়ত প্রিয়নাথ এ দিকে সচেতন হলে তাদের এ পরিণতি হতো না। সে সংসার, পরিবারকে ফাঁকি দিয়েছে।

সন্ধ্যায় আজ আর প্রিয়নাথ বাইরে গেল না। পত্রিকা অফিসে জরুরী কাজ ছিল, দেবব্রতকে বলে এসেছিল ছ'টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে কিন্তু অসম্ভব মানসিক চাপে খাওয়া-দাওয়ার পর পেটে চিন-চিনে ব্যথা ওঠায় ট্যাবলেট খেয়ে বাইরের ইজিচেয়ারটায় দেহটা এলিয়ে দিল। তার মনে পড়ে না কবে সন্ধ্যায় বাসায় শুয়ে কাটিয়েছে। মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। আকাশের গা থেকে

আলো মুছে যাচ্ছে, বড় বড় বাড়ি ঘরের মাঝে তাদের বাসাব বারান্দাটুকু এবং পাশের টালির চালায় বিষণ্ণতা ঝুলে ঝুলে পড়ছে। সামনের কাঠ চাঁপা গাছের ঘন সবুজ লম্বা পাতাগুলো মৃদু হাওয়ায় দোলে, বারান্দাব পাশে ঘাসের ঝোপ থেকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকে। কোন কোন বাড়ি থেকে রেডিও বাজছে, টি, ভির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, ঝিয়েরা যাতায়াতের পথে নিজস্ব গল্পে মত্ত। গলির মোড়ে দ্রুত দু চারটে প্রাইভেট কারের হর্ণ, অনেক দূরে রেললাইনে আপ-ডাউন লোকাল ট্রেনের শব্দ। বালিগঞ্জের নামকরা মশা ছেঁকে ধরেছে প্রিয়নাথকে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, খোকা গোমরা মুখে তার জমানো দেশলাই বাক্সগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছে। প্রিয়নাথ একদিন ওগুলো দিয়ে এক্‌জিবিশন করবে—এমন অনেক উদ্ভট বুদ্ধি প্রায়ই তার মাথায় ঘুর পাক খায়। এ সকলের মধ্য দিয়েও সমাজকে নাকি বোঝা যায়। খোকা নীরবে সেগুলো দেখছে এখন।

—বাবা! প্রিয়নাথ ডাক দেয়। আদিনাথও আছেন পাশের খোপে। বই পড়ায় ক্লান্তি এলে শুয়ে পড়েন। নীরজা দেবী বলে, এখন একটু রাখো, এই সেদিন ডান চোখটার ছানি কাটালে।

ছেলের ডাক শুনে আদিনাথ জবাব দেন—ডাকছিস?

—বলছিলাম খোকাকে নিয়ে বাইরে খানিকটা বেড়িয়ে আস্থন না? এভাবে বন্দী হয়ে থাকা ·!

আদিনাথ টুক টুক করে এ ঘরে উঠে আসেন।

—কোথায় যাব বল? চোখে ভালো দেখি না, যে ভাবে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করছে, ভয় লাগে।

—লেক পর্যন্ত না যান, গোলপার্কে গিয়ে বস্থন!

—যা ভীড় কে ধাক্কা দিয়ে ফেলে!

খোকা বলে ওঠে—আমি দাদুর সঙ্গে যাবো না। আদিনাথ দুঃখে ফিস্ ফিস্ করে উঠলেন—শুনলি? কার ভরসায় বেরব? প্রিয়নাথ চুপ করে থাকে।

আগে প্রাতঃভ্রমণে আদিনাথ লেকে যেত, সন্ধ্যায় গোল পার্কে।

অনেক বৃদ্ধ সেখানে আসে। এক কালের রিটায়ার্ড জজ থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক অনেকেই। এই বিশাল কলকাতার প্রবহমান জনজীবনের মধ্যে এই বৃদ্ধদেরও একটা মন্থর, স্থবির সমাজ বা সংঘ আছে। বর্তমানের সব কিছু সমালোচনার মধ্যে অতীত গৌরবের অভিমান নিয়ে এরা মুক্ত বায়ু সেবন করে, কামনা করে দীর্ঘায়ুর। এককালে আদিনাথ গভীর ভাবে এই পরিবেশে মিশতো। ধীরে ধীরে টের পেয়ে গেলেন, কর্মজীবন সবার বিলীন হয়ে গেলেও, আভিজত্যের গৌরব মুছে ফেলতে পারেনি। এরা সনাতন ধর্মের আলোচনা করে, সাদার্ন এভিনিউর মস্ত কালিবাড়ীতে জড় হয়, আবার চাঁদা তুলে প্রতি রোববার কারও না কারও বাড়িতে প্রীতিভোজে মিলিত হয়। এই ভোজের পিছনে আর কিছু নয় অতীতকে স্মরণ করে আর প্রেসার সুগার ফ্যাটকে উপেক্ষা করে লোভীর মত ছানা মিষ্টি খায়। বোঝা যায় সারা সপ্তাহ যে যার বাড়িতে ছেলে, ছেলের বউ বা স্ত্রীর জ্বালায় নিষিদ্ধ:খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। শিশুর মতো প্রতি রোববার বাড়িকে ফাঁকি দেয়ার জন্যই এ প্রীতিভোজ। আদিনাথ দু দুটো নিমন্ত্রণ খেয়ে টের পেয়েছেন এটা তাঁর যায়গা নয়। নিজেকে প্রক্ষিপ্ত মনে করার পর ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন। শুধু পাণ্ডিত্যের কদর এ সব আসরে আর নেই। মিথ্যা অহং বোধ ট্যাবুর মতো জাঁকিয়ে আছে এখানে। একদিন সকালে লেকের পাশে বেঞ্চিতে বসে এক রিটায়ার্ড জজ গদগদ হয়ে বলেছিল—আজকাল কালচার বলে কিছু নেই, আমাদের পুরোনো কলকাতার একটা কালচার ছিল। বইপত্তর পড়ে দেখবেন! আদিনাথ এক পাসে বসে ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—না সেনগুপ্তবাবু, তা বলবেন না! সবাই তাকিয়ে পড়েছিল আদিনাথের দিকে।

—কলকাতা কালচার তো কেষ্টনগর নদীয়ার সস্তা খেউড় আর ইংরেজ কালচারের মিশ্রণ। বিষয়টা কি খুব উৎকৃষ্ট?

—মশাই কি, কালচার-টালচার নিয়ে পড়া শুনো করেন?

—তা করি। সুতানটির ঘাটে সেই খেউড়ের রস চন্দননগর

বেয়ে এল। আর হোয়াইট স্কিন—সাদা চামড়াদের কালচার। ঐতিহ্য হলেই তা নিয়ে গদ গদ হবার কিছু নেই।

শুধু কতগুলো বিজ্ঞতর হাসি শোনা গেল এবং পাশের ভদ্রলোকেরা সেনগুপ্তকে জিজ্ঞেস করল – আমাদের এই কালচারে সনাতন ধর্মের প্রভাব নিয়ে কিছু বলুন। আমি কাল রাধাকৃষ্ণাণের একটি বই পড়ছিলাম…

ওরা পরস্পর আলোচনায় এমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, আদিনাথকে গুরুত্বই দিল না। আদিনাথ ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে এনেছিলেন।

পাড়াতেও বেশি বার হন না। কেউ চেনে না তাকে—ভুলে গেছে—এটাই তার বড় কষ্ট। গলিটা পেরোলেই যে ভাবে প্রাইভেট কার পেছনে প্যাকপ্যাক হর্ন দেয়, মোটর সাইকেল, স্কুটার চলে, আদিনাথকে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। গলি থেকে বেরোলে একশ জনের মধ্যে একজনও কুশল জিজ্ঞেস করে কিনা সন্দেহ। কেবল পুরোনো কয়লার দোকানের মালিক বলে—কেমন আছেন মাস্টারমশাই? আদিনাথের বুকটা হালকা হয়, শারীরিক বিষয় থেকে দেশের নানা কথা অনর্গল বলে যান আদিনাথ তার কাছে!

কেবল পুরোনো কালের বলতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটা ক্লাব ছিল, মাঝে মাঝে শরীর ভালো থাকলে সেখানে যান। আদিনাথ কোনদিনই সবাসরি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন নি, তবে কাকুলিয়া আসবার পর, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্ঘটি গড়ে উঠতে যোগাযোগ রাখতেন, দেশ সমাজ জাতি নিয়ে আলোচনা হত সেখানে। সেই থেকে সম্পর্কটা রয়ে গেছে। অনেকেই আজ নেই তাদের, একে একে বিদায় নিয়েছেন। সামান্য দু চার জন যারা আছেন, কিছুদিন হল তাদের মধ্যে তিনজন তাম্রপত্র এবং পেন্সন ভোগ করছেন। কচিৎ কদাচিৎ কোন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে স্মরণ করার দিন থাকলে, এখানে তারা মিলিত হয়, আদিনাথের নামে একটা কার্ডও আসে। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে, লাঠি হাতে ভাঙ্গা-চোরা কিছু মানুষ

স্মৃতিপটে অতীতে ডুব দেন, বর্তমানের জন্য হা হুতাশ করেন, ধূপ-ধুনো বা সামান্য জলযোগের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। আদিনাথের ভালো লাগে এসব, কিন্তু রোজ তো ওরা মিলিত হয় না। তাই অনেক দুঃখে আদিনাথ সকাল সন্ধ্যা ঘরের আশ্রয়ে থাকেন! প্রিয়নাথের প্রস্তাবে মনটা একটু ঝিলিক খেলেও, রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি ও চোখের দোহাই দিয়ে নিজেকে নিরস্ত রাখলেন।

আজ পত্রিকা অফিসে প্রিয়নাথ খুব গল্প, রসিকতা করছিল। বাসায় মানসিক চাপ পড়লে বাইরে সে এটাই করে। বুঝতেই দেয়না তার দুঃখকে। বাসার ঐ ঘটনার পর থেকে দাস কেবিন, পত্রিকা অফিস এবং বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে অনর্গল রসিকতা করে যায়। কেউ কেউ বলে—খুব মুডে আছেন প্রিয়দা? নাস্তিক প্রিয়নাথ বলে—সবই তেনার ইচ্ছায়।

পত্রিকা অফিসে তার টেবিলকে ঘিরে যখন লোকজন জমে উঠেছে, ব্রজেশবাবুকে বলল—কাগজটাকে তো বটতলা বানিয়ে তোলা হচ্ছে।

—কেন?

—যা ছাপার ভুল চ'লছে সেই 'শবল কাবল ভূষি ভূষি সে কাবল!' দেবব্রত হো হো করে হেসে উঠল।

—তার মানে?

—আমাদের ছাপাখানার ইতিহাসতো বটতলা! কপিতে আছে 'সকল কারণ তুমি, তুমি সে কারণ'। বটতলার ব্যাপার, 'ক'—অক্ষরের ধারের লেঙ্গুটা চাপের চোটে খসে যায়; 'শ' ও 'স' যথেষ্ট না থাকলে বদলে যা খুশি দেয়া হচ্ছে, 'র' অক্ষরের মধ্যের পেটটি কাটা, ছেনি কাটা 'ভ' ও 'ত' এর পার্থক্য বোঝা যায় না। 'ভ' কম পড়লে 'ষ' দিয়ে চালাচ্ছে। তাই বলি কাগজটাকে বটতলা বানিয়ে তুলেছেন, প্রুফরিডার আর কম্পোজিটারদের ডাকুন তো!

ব্রজেশবাবু মুখে জরদা ফেলে মিটি মিটি হাসলেন।

—বেশ কালেকশন করেছেন মশাই। তবে আমাদের কাগজকে

একেবারে বটতলার সঙ্গে তুলনা করলেন ?

—খারাপ বললাম কি ?

—ভূধরবাবু শুনলে দুঃখ পাবেন।

—ও শালা কাগজের কি বোঝে ? মালিক সেজে আছে এই যা। আর বটতলা বলছেন, ঐ ছেপেও বটতলা যা উপকার করেছে আপনার এখনকার বোটারি ফটো অফসেটরাও তা পারবে না।

দেবব্রত বলে—বটতলা তো কোকশাস্ত্র, রতিবিলাস ছাপে প্রিয়দা। তারপর তো বিখ্যাত গড়ানহাটা !

প্রিয়নাথ মেজাজে টেনে বলে—ছেলে-ছোকরা তো, গরানহাটাই চিনবে !

টেলিপ্রিণ্টার মেশিনটা শব্দ করে বেজেই চলেছে। টেবিলে চায়ের ছেলেটা খটাখট্ কাপগুলো বসিয়ে চা ঢালল। বেশ গরম, ধোঁয়া উড়ছে। প্রিয়নাথ চুমুক দিয়ে তারিফ করল। ব্রজেশবাবুর দিকে তাকিয়ে আবেগের সঙ্গেই বলে—তা হলেও বটতলার অবদান ছোট করতে পারবেন না। ঐ শবল কাবল ভূষি ভূষি করেও সে যুগে কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, চৈতন্যচরিতামৃত —ছেপে বার করেছে। লঙ্ সাহেবের একটা তালিকা থেকে দেখলাম, মশাই অবাক হবেন, আজ থেকে দেড়শ বছরেরও আগে আটখানা বৈষ্ণব গ্রন্থ, তিন খানা শাক্ত-শৈব ভক্তিগ্রন্থ ছাপা চাড্ডি-খানি কথা ? প্রুফরিডার সত্যেন এসে সামনে দাঁড়াতেই প্রিয়নাথ বলে—কি হচ্ছে সত্যেন ? এত ভুল থাকছে কেন ? একটু মন দিয়ে দেখো !

—আমাদের বললে হবে না।

—কেন।

—কম্পোজিটারদের বলুন। কেরিআউট না করলে কি করব ? কাটাপ্রুফ আছে, এনে দেখাচ্ছি !

ঠিক সেই সময় শঙ্কর উপস্থিত। তাকে নিচ থেকে ডেকে আনা হয়েছে।

প্রিয়নাথ বলে—এই যে পাণ্ডা এসেছেন! বলি মার খাওয়াতে চাও আমাদের। ছাপার কোন মা বাবা থাকছে না।

আজকের ছাপা কাগজখানা খুলে প্রিয়নাথ দেখায়—লেখা হলো খোদ সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ছাপলে পোদ সরকার? খ এর যায়গায় প? ভাগ্যিস চ বসাও নি! সমস্ত ঘরখানা হো হো হাসিতে ফেটে পড়ল। এই উচ্চ অট্টহাস্যে টেলিপ্রিণ্টার মেশিনটার শব্দ পর্যন্ত চাপা পড়ে গেল। শঙ্কর আহত হয়েছে। চোখ জোড়া স্থির। সিসের গ্যাস এবং স্যাঁত স্যাঁতে ঘরে দিনরাত শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে, এমনিতেই চোখজোড়া অসুস্থ। এখন আরও গভীর হয়ে উঠল।

—আঙ্গুল কেটে সেট করব প্রিয়দা? টাইপ কেনে মালিক? পচা-ধচা খয়ে-যাওয়া টাইপে কাগজ চলে না। ছেপে দিচ্ছি এই যথেষ্ট!

প্রিয়নাথ বুঝল কথাটা ঠিক।

—সত্যি, পাঁচু কামারের টাইপ! ফাউণ্ড্রিতে টাকা বাকি, একটা পয়সাও খরচ করবে না শুধু বড় বড় কথা। ছেড়ে দেব আমি। কি খ্যাঁচাকলে পড়লাম! বিনিপয়সায় কাগজ চালাতে চান!

শঙ্কর চলে যেতেই, হঠাৎ প্রিয়নাথের কি খেয়াল হল। দ্রুত চেয়ারটা সরিয়ে 'আসছি' বলে পেছন পেছন শঙ্করকে ধরে। শঙ্কর অবাক! হয়ত টাইপ সংক্রান্ত ব্যাপার। প্রিয়নাথ কাছে এসে বলে—শোন! তারপর দু জনে নিভৃত একটা জায়গায় এসে দাঁড়ায়। শঙ্কর হাঁ করে থাকে। প্রিয়নাথের কথাবার্তায় এখন কোন চপলতা নেই। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করল—সেই যে ডায়মণ্ডহারবারে বাসার কথা বলেছিলে, আছে? গুরুভার নেমে গেল শঙ্করের বুক থেকে। ভেবেছিল প্রিয়নাথের সঙ্গে ভূধরবাবুর কাছে যেতে হবে। হকচকিয়ে হেসে ফেলল খানিক। হাসলে শঙ্করকে খুব সুন্দর দেখায়। কয়েকদিনের আচাঁছা দাড়ি এবং ক্লান্ত চোখজোড়ায় হাসিটি আরও মাধুর্যপূর্ণ। নিকট আত্মীয়ের মত প্রিয়নাথের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

—সে তো কবে বলেছিলাম। আপনি গা করলেন না।

—গা করেছি, তবে ভাবনাচিন্তা করতে সময় লাগে তো!

—এখন কি আর আছে সে বাসা?

—অন্য কিছু যদি থাকে!

শঙ্কর হেসে বলে—তা থাকবেনা কেন। কেন বলুন তো?

—থাকলে তোমাদের এলাকায় উঠে যেতাম!

—ধাৎ, আপনি ইয়ার্কি করছেন।

—ইয়ার্কি? ইয়ার্কি করব কেন?

—আপনারা বালিগঞ্জের লোক, ডায়মণ্ডহারবারে কি করবেন?

প্রিয়নাথ একটু চুপ করে থাকে। আবেগে বলে ফেললেও সমস্ত ভাঙ্গিয়ে বলতে শঙ্করের কছে বাধ-বাধ ঠেকছে। আর এ ব্যাপার-গুলো এক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বলাও যায় না। সত্যিইতো, কলকাতা—এই বালিগঞ্জ ছেড়ে কেউ ডায়মণ্ডহারবার যায়?

শঙ্কর জিজ্ঞেস করে—বলছিলেন যে সরকারী ফ্ল্যাট, তার কি হলো?

—হ্যাঁ, বলেছিলাম, মনে হচ্ছে পাবো না। সরকারী ব্যাপার, লালফাঁসের গেরো খুলতে জুতোর শুকতলা ছিঁড়ে যায়। আর ধরা করা আমার ধাতে আসে না। অনেক বন্ধুবান্ধব আছে ওখানে।

—শুনি কাগজের লোকদের সুবিধে দেয়?

—দেবে না কেন, সে রকম কাগজ হলে দেবে। আড়াই পয়সার কাগজের আবার সুবিধে কি? আমরা হলাম হাঁসজারু। হ্যাঁ, আর হতে পারে পাচ দশ হাজার যদি ঘুষ দিতে পারি। অত টাকা কৈ? আর থাকলেও, ঘুষ দিয়ে ফ্ল্যাট? কলকাতা থাকার এমন মাথার দিব্যি নেই আমার!

—যে বাসায় আছেন কি হল?

—না, না সে বাসা ভাল। তবে বাড়িওয়ালার দরকার, শুনছি বাড়ি বিক্রি করবেন।

—কিন্তু প্রিয়দা, অতদূর পোষাবে আপনাদের? কলকাতার

অন্য কোথাও পাচ্ছেন না? সত্যি কলকাতায় অন্যকোথাও যেতে পারে প্রিয়নাথ। শঙ্করের কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু বলতে গেলে যে প্রসঙ্গ ঘুরে-ফিরে আসবে, মূলকথা তার ভাঙিয়ে বলা যাবে না শঙ্করকে। আর বললেও শঙ্কর বিশ্বাস করবে না। কি লাভ? অনেককিছুই জীবনে অনুক্ত রাখতে হয়। মানুষতো একেবারে সংস্কারমুক্ত নয়। একটা দৈনিক পত্রিকার, যাই নগণ্য প্রচার সংখ্যা থাক তার, সম্পাদক কি সামান্য কম্পোজিটরকে ঘরের কথা খুলে বলতে পারে?

—হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে কলকাতায় কালই বাসা পাই। কিন্তু ভাড়া গুনে আর ভালো লাগে না। ইচ্ছে একটু জমিজিরেত কিনবার। আজকালকার দুনিয়া, একজন জানাশোনা দরকার। নইলে তো কলকাতার একেবারে কাছেই কিনতে পাবি। এ তুমি প্রতিবেশী রইলে।

—তা বটে! ভাড়া গুনে যতই বড় ফ্ল্যাটে থাকুননা কেন, নিজস্ব জমিজমা বাড়িঘরের শান্তি আলাদা। সারাদিন ঘেমে নেয়ে কি হাজার খাটাখাটনির পর, একবার বাড়িতে আশ্রয় নিলে চরম শান্তি। স্বাধীন! যেমন ভাবে খুশি চলাফেরা কর, থাক, বলার নেই কিছু। এই যে শঙ্কর—কলকাতার এত কষ্ট, ছাপাখানার অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি, হাজার টানা পোড়েন,'জ্যাম, ব্রেকডাউন কাটিয়ে একবার বেড়ার আর টালির চালার তলে ঢুকলে মনে হয় নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে। প্রিয়নাথের যুক্তিটা শঙ্করের মনে ধরতে, উৎসাহিত হয়ে বলে—ঠিক! ঠিক! ও বাসাটা নেই তো কি হয়েছে। আসুন আপনি, বাসার অসুবিধে হবে না।

—তারপর এতদিন বলিনি কেন জান, শহরে থাকার অভ্যেস। ছেলের স্কুল, বুড়ো মা বাবা তা ছাড়া বাইরের ধাক্কা সামলাবার অভ্যেস আমারও নেই। যাইহোক, এখনও যদি অভ্যেসটা না পালটাই, ছেলেটার ভবিষ্যৎ তো আছে! আমাদের যা হবার তো হল কিন্তু ওদের?

—আমিতো কখনই রাজি নই কলকাতা থাকতে। তাছাড়া আরও ব্যাপার আছে, আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না,··· যাক্, কবে যাবেন বলুন।

—তুমি ব'লো। সামনের রোববার?

শঙ্কর ভাবল। অর্থাৎ সামনের রোববার কোন সিপ্টে ডিউটি।

—হ্যাঁ, বিকেলের সিপ্ট, আসুন সামনের রোববারই। খুব ভোরে চলে আসবেন, খেয়ে দেয়ে বিকেলে ঐ পাঁচটা ছাব্বিশের ট্রেনটা ধরব।

—না, না খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে না তোমায়। পাগলামি করবে না।

—তালে দরকার নেই যাওয়ার। গরীবের বাড়ি যাবেন আর ছুটে। ডালভাত খাবেন না, হয় কখনো?

—কেন, চা বিস্কুট খাবো।

—ও সব শহরের ভদ্রতা গাঁয়ে চলে না।

প্রিয়নাথ বলে—ডায়মণ্ডহারবারও এখন শহর।

—আমার বাড়ি ছু মাইল ভেতরে। গ্রামই বলতে পারেন!

মুখে প্রকাশ না করলেও, প্রিয়নাথ চমকে গেল ; স্টেশন থেকেও ছু মাইল!

—প্রিয়দা শোন! দেবব্রত দূরের দরজা থেকে চেঁচিয়ে উঠল। শঙ্কর চলে যায়।

ডায়মণ্ডহারবারের কথা প্রিয়নাথ বাসায় প্রকাশ করল না। শঙ্কর বললেও খেয়ে আসবে না:মনে মনে সে ঠিক করেছিল। তাই বিশেষ ভাবে জানিয়ে লাভ নেই। এমনকি সে রবিবার দাসকেবিনে সকালে দেখা করার জন্য অনেককে কথাও দিল। আগের দিন রাতে একবার ভেবেও ছিল ডায়মণ্ডহারবার গিয়ে লাভ নেই। এতদিনের নগরজীবনের অভ্যেস রাতারাতি ছেদ করা যায়? তবুও ভোরবেলা কিসের একটানে প্রিয়নাথ স্নানটি সেরে রওনা হয়ে গেল।

বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ। গাড়িতে ভিড়ের চাপ আছে, গুতোগুতির কষ্ট, অনভ্যস্ত প্রিয়নাথের শ্বাসকষ্টও হচ্ছিল,

তবু ধরা-বাঁধা জীবনের বাইরে এসব এক-আধদিন মন্দ লাগে না। একটু রিলিফ পাওয়া যায়। শঙ্কর স্টেশনেই অপেক্ষা করছিল, প্রিয়নাথকে দেখতে পেয়ে রিক্সায় তুলে সটান নিয়ে এল বাড়িতে। স্টেশন থেকে আসতে মিনিট সাত-আটের পথ। চাঁচের বেড়া, টালির চালার সাথে তিনখানা ঘর শঙ্করদের। দুবোন, একভাই এবং মা বাবা নিয়ে সংসার। ছোট ভাইটার স্টেশনের সামনে ছোট্ট একটি চায়ের দোকান। সংসারের উপার্জনশীল এরাই দুজন। তাই বাড়ির আবহাওয়ায় অস্বচ্ছলতা বুঝতে নতুন কোন মানুষের অসুবিধে হয় না। প্রিয়নাথ দেখল প্রতিবেশীরও মোটামুটি উনিশ-বিশ অবস্থা। প্রত্যেকরই সংলগ্ন কিছু জমি, শাক-সব্জি বোনার চেষ্টা।

—এই হলো গরীবের আস্তানা। আপনার কাছে বলতে লজ্জা কি আছে।

—সারা দেশটাই গরীব, তুমি নতুন কি বললে।

—তবুও, শহরের লোকদের একটু অসুবিধে হয় তো!

শঙ্কর তার বাবা মুকুন্দবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ওদের বিনয় এবং আতিথেয়তায় মনে হচ্ছে প্রিয়নাথ শঙ্করের চাকরির দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। মুকুন্দবাবুর হাঁপানি। দেশের বাড়িতে পুজো-অর্চনা করত, এখন মাঝে মাঝে শরীর ঠিক থাকলে লক্ষ্মী সরস্বতী পুজোটা সেরে দেয়।

—আপনাদের দেশ কোথায় ছিল?

—ওপার। প্রিয়নাথ উত্তর দেয়। আপনাদের?

—আমারও। আসছি সিক্সটি ফোরের পর, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ হইল! এই একটু মাথা গুইজা আছি, আর কিছু না।

—সেটুকুই বা কজনের আছে!

মুকুন্দবাবু হাসে।

—শঙ্করের কাছে আপনার কথা শুনছি। আপনাগো কাছে আছে দেইখেন একটু। বিয়ার বয়স হইল, বোনদের না নামাইয়া ওতো কোন কথা শুনতেই চায় না।

—ভালই তো, বোনদের নামাক আগে।

মুকুন্দ কাশল দুবার। চোখমুখ লাল হয়ে উঠল তার।

—সম্বন্ধ তো পাইনা। পাকিস্তানের মানুষ, ফুটা কড়ি নিয়াও আসতে পারি নাই। লেখাপড়া শিখতে পারে নাই। ছেলে জুটে কি কইরা কন? যদি টাকা থাকত! আইজকাল, টাকা না নিয়া কোন ছেলে বিয়া করতে চায়?

প্রিয়নাথ লক্ষ্য করেছে শহরের লোক চা বেশি খায় বলে সুন্দর কাপ ডিস আনিয়ে রেখেছে। হয়তো পাশের একতলা বাড়িটা থেকে নয়তো সাপ্লাই হয়েছে ছোট ভাইয়ের চায়ের দোকান থেকে। প্রিয়নাথ দেখল শঙ্করের বোনদুটো মাঝেমাঝেই ছুটছে পাশের বাড়িতে। তবে শহরের চা জোগাড করতে পারেনি। পাতি নয় গুড়ো, এবং চিনি বেশি, দুধ কম বলে চায়ের র টা রক্তাভ। তবুও আতিথেয়তা প্রিয়নাথকে মুগ্ধ করে।

কলকাতা থেকে যাবার সময় ঠিক করেছিল, খাওয়া-দাওয়া সারবে না। কিন্তু এ বাড়িতে নতুন পরিবেশে এসে প্রিয়নাথ বুঝল মধ্যাহ্নের আহার প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। একবার শুধু শঙ্করের কাছে প্রস্তাব করেছিল:

—বারোটা বাজে, গাড়ি কটায়?

—মানে? কি মতলব আপনার? গাড়ির কথা জিজ্ঞেস করবেন না। না খেলে বাসা দেখাই না। তা ছাড়া যাবেন কি করে, আড়াই-টার আগে কোন ট্রেন নেই, একি কলকাতার ট্রাম বাস?

বাসা দেখতে গেল দুপুরের আহার সেরে। স্টেশন ও শঙ্করদের বাড়ির মাঝপথে একতলা দালানখানা। বাড়িওলা থাকে না; ফলে গোটা বাড়িখানাই প্রিয়নাথদের দখলে থাকবে। প্রচণ্ড আলো হাওয়া এরং পেছনে বেশ কিছুটা ফাঁকা মাঠ এবং ঝোপঝাড় দেখে প্রিয়নাথের অদ্ভুত ভালো লেগে গেল। মনে পড়ল মঞ্জু আর খোকার কথা। নিশ্চয়ই মঞ্জু থাকলে আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়ত। বেচারী সারাদিন ভাঙ্গা দালানটার স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকারে, রান্নাঘরের

অস্বাস্থ্যকর আবদ্ধতায় আলোকের বর্ণ চিনতেই ভুলে গেছে। আর খোকা? নিশ্চয়ই সারাদিন ঝোপে ঐ ফড়িং-এর পিছনে ছুটবে। বাসাখানা সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। শঙ্করকে জিজ্ঞেস করে এখানের পরিবেশ কেমন?

—মোটামুটি। খুনসুটি, ঝগড়াও আছে আবার হাসি-গল্পও চলছে।

—কিন্তু আমরা এলে তো ভাড়াটে হিসেবে···

—তাতে কি! এমন অনেকেই আছে। সকলেরই পাড়া এটা।

অনেককিছু ভাবতে ভাবতে কি যে হয়ে গেল প্রিয়নাথের, কথাই দিয়ে বসল।

খেয়ে দেয়ে, বিশ্রাম করে ওরা গেল গঙ্গার ধারে ঘুরতে। বিশাল নদীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথের মনে হল কোথায় যেন একটু মুক্তির স্পর্শ। নদীবক্ষে লঞ্চ, নৌকো এবং চলমান জাহাজগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবে এই ভারতবর্ষ অনেক বড় এবং মহান। কলকাতায় বাসট্রামের ঘণ্টাধ্বনি এবং বড় বড় হোর্ডিংয়ের মাঝে এ অনুভূতি হারিয়ে যায়। খোকার জন্য দুঃখ হয় তার। ছেলেটা সঙ্গে থাকলে খোলা মনে ঘুরতে পারত। দিন দিন যেভাবে গুম মেরে থাকে তাতে একদিন বিকৃত মানুষ হতে বাধ্য হবে। স্বার্থপর, ভোগী এবং স্থূলরুচির।

বিকেলের ছায়ায় ওরা ফিরে আসে পাঁচটা ছাব্বিশের ট্রেন ধরার জন্য। এইটুকু সময় কলকাতায় নেই, প্রিয়নাথের মনে হয় দীর্ঘদিন সে শহরের বাইরে।

ফেরার সময় বেশ কষ্ট হল তার। মাঝে দু-দুবার কারেন্ট অফ্ হয়ে গিয়ে, ভীড়ের মধ্যে নিঃশব্দে ঘেমে গেছে। আধঘণ্টার মতো তরকারির ঝুড়ির চাপ, হকার, ভিখিরি যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। সিগেরেট টানতে গিয়ে গা গুলিয়ে বমি এসেছিল প্রিয়নাথের। প্রায় আধঘণ্টা লেটে বালিগঞ্জে নামল প্রিয়নাথ, শঙ্কর চলে গেল সোনা নটায়। বালিগঞ্জে নেমে প্রিয়নাথ টের পেল পিঠে অসম্ভব ব্যথা হচ্ছে

তার। ট্রেনের সমস্ত পরিবেশ, ঘাম, শব্দ, চেঁচামেচি এবং ঘণ্টাখানেক ধরে যাত্রীচাপের নরকযন্ত্রণা তার সহ্য হবে না। ভুল হল শঙ্করকে কথা দিয়ে। এভাবে মানুষ নিত্য যাতায়াত করে? মানুষ যেভাবে গাদা-গাদি হয়ে কারেন্ট বন্ধ অবস্থায় আটকে ছিল, বেশ কয়েকটা যে অজ্ঞান হয়ে পড়েনি, ভাগ্য। তিরিশ বছরের অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় প্রিয়নাথ কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছে না। এখন, বালিগঞ্জের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পিঠের ব্যথাটা ঘাড়ের দিকে ছড়িয়ে যেতে, অসম্ভব ক্লান্তি ও অবসাদে পাথরের বেঞ্চে গিয়ে বসল। ব্যস্ত স্টেশনে ট্রেনের যতই শব্দ হোক, যাত্রীর কোলাহল যতই বাড়ুক, একটু বিশ্রাম না করে একপাও সে এগোতে পারবে না। এ্যাসিড বাড়তে পারে ভেবে, একটা জেলুসিল ট্যাবলেট মোড়ক ছিঁড়ে চুষতে থাকে।

বিকেল থেকেই কাকুলিয়ার বাসা একটু হাঁকডাক, বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিল। প্রিয়নাথ সেই সকালে চান করে বেরিয়েছে, তখনও ফিরছিল না। যদিও এমন কাণ্ড করার অভ্যেস আছে প্রিয়নাথের তবু মঞ্জুর চিন্তা হয়। শহরে যে ভাবে দুর্ঘটনা ঘটছে, এখানে রাস্তাঘাটে কোন সিকিউরিটি নেই। সারাদিন বাড়িতে জল নেই। কর্পোরেশনের জল সরবরাহ বিকল। সারাদিন কোন রকম কষ্টে কাটিয়ে মঞ্জু বিকেলের দিকে বাধ্য হয়ে বলল—বাবা, জলতো এখনো এল না! কি করি?

—ইস্! সারাদিন জলবন্ধ! আজ কি কাগজে জানিয়েছিল কিছু?

—কি জানি, একজনতো সাতসকালে বেরিয়েছে, কোন খবর নেই!

আদিনাথ বোঝেন এখন একমাত্র জল সংগ্রহের উপায় রাস্তা। গলির মধ্যে রাস্তার উপর যে টিউবওয়েলটা আছে, সেখানে নিশ্চয়ই ভীড় জমেছে। সব বাড়ি থেকেই ভারী লাগিয়েছে আর বস্তির দিকের খেয়ে-বউরা হাঁড়ি, বালতি নিয়ে গিস্ গিস্ করছে। টুক্ টুক করে দেখতে আসেন আদিনাথ। মঞ্জুই পাঠিয়েছে। আশপাশের বাড়িতে যখন ভারীই ভরসা, ওরাও বাঁক দশেক জল তুলিয়ে রাখতে পারে।

আদিনাথ একবার নিজেই টানবেন বলতে মঞ্জু বারণ করে বলেছিল—শরীরে কুলোবে না, তা ছাড়া কোন বাড়ির লোক টানছে? এত জল টানা চাট্টিখানি কথা! কথাটা আদিনাথেরও পছন্দ! এরকমে চাপ দিয়ে কল পাম্প করে জল টানার ভরসা পাচ্ছিলেন না।

কিন্তু ভারীদের কাছে দর শুনেই আদিনাথের মাথায় হাত। হঠাৎ চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ভারপ্রতি একটাকা করে নিচ্ছিল, এখন বিকেলের দিকে পাঁচ সিকে। —জল! জল পাঁচসিকে? ভারীরা মুখ বাঁকিয়ে বলে—হ, হ, বাবু জল। পাঁচ সিকায় দুধ ঢালি দিব? কলের পাশে মেয়েছেলেদের ভীড়টা হেসে ওঠে।

—কি, কি বললে? আদিনাথ ক্রোধে কাঁপতে থাকেন। চড়িয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব! কি ভাবে কথা বলতে হয় জান না? আদিনাথের কণ্ঠে সে কি নিনাদ! রাস্তায় লোক জমে যায়। তারা উল্টে ভারীদেরই ধমকে দেয়। শত হলেও, বুড়োদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় শেখা উচিত। মিঃ সুরের স্ত্রী জানলা খুলে কৌতুক উপভোগ করছিল, হঠাৎ আদিনাথের সঙ্গে চোখাচুখি হতে মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ভাবটা হল, প্রয়োজন যখন জলের, দাম জিজ্ঞেস করে সিন ক্রিয়েট করছেন কেন? কি আর এমন বেশি নিচ্ছে। আদিনাথ হঠাৎ থেমে ভারীদের উদ্দেশে বলেন—কোলকাতায় পয়সা সস্তা না? আমার ঘুষ আর কালো টাকা নয়, পাঁচ সিকে জল? কথাটা যেন ভীড়ের মধ্যে আরও হাসির উদ্রেক করল। তারা আদিনাথের ক্রোধান্ধ অঙ্গভঙ্গির দিকে তাকিয়ে হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়তে থাকে।

বুকটা কিছু শান্ত হলে, লম্বা লম্বা পা ফেলে বাসায় এসে আদিনাথ হাঁক দেন—বৌমা, বালতি দুটো দাও।

—আপনি আনবেন? সেকি?

—কেন? নিজের জল নিজে টানতে লজ্জা কি? খোকা কোথায়, ওকেও ছোট বালতিটা দাও।

মঞ্জু কি ভেবে ছোট ছোট প্লাস্টিকের বালতি আদিনাথের সামনে

রাখল। বউ হয়ে নিজের পক্ষে রাস্তা থেকে জল টানা অসম্ভব।

আদিনাথ ডাকলেন—খোকা!

—আমি পারব না।

—কেন?

—আমার লজ্জা লাগে। আদিনাথ জবাব দিলেন না। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বালতি দু'টো টেনে নিয়ে চলে গেলেন। মঞ্জু বলে—খোকা, দাদু একা পারবেন না, তুই যা।

—আমি এখন জল টানব?

—দাদু রেগে গেছেন, ভাল হবে না বলছি!

খোকা খানিক ভুরু কুঁচকে ছোট্ট একটি বালতি হাতে বেরিয়ে যায়।

টুকাই দোতলার জানলার ধারে বসেছিল। খোকা জল টানে আর দুরু দুরু বুকে বাড়ি-ঘরের জানলার দিকে তাকায়। টুকাইর সঙ্গে চোখাচুখি হতে হেসে বলে—ভারী! ভারী! খোকা তাকায় কটমট করে। বার বার শুনতে শুনতে দাদুকে বলে—আমায় ভারী বলছে কেন?

—বলুক, তোর কি?

—আমি পারব না, বালতি রইল। তুমি কিছু বলবে না?

—যা হতভাগা! টানতে হবে না তোর! খোকা দুমদুম করে বাসায় গিয়ে বারান্দায় গুম হয়ে বসে। আদিনাথের প্রচণ্ড রাগ হয়, কথা বলেন না কিছু। নিঃশব্দে জল টেনে যান। তবুও বয়সের বাধা বলে কিছু আছে। এই সব স্নায়বিক উত্তেজনা এবং কায়িক পরিশ্রমে তিনি হাঁপাতে থাকেন। ঘাম হয়, কপালের রগ ফুলে থাকে। বার বার জলভরা বালতি নিয়ে থেমে থেমে চলতে হয়। মাঝে মাঝে রাস্তার ইটে ধাক্কা খান।. হা ঈশ্বর! মনে মনে অনুতাপ করেন! খোকাকে বসে থাকতে দেখে ভেবেছিলেন, দাদুর কষ্টে সে হয়তো একসময় বালতি হাতে এগিয়ে আসবে। তবুও যখন খোকার নড়ার লক্ষণ দেখা গেল না, একটু চেঁচিয়ে বললেন—তুই উঠবি না, হতভাগা?

—ডেভিলের মত চেঁচাবে না।

—আমি ডেভিল? বালতি রেখে আদিনাথ বিস্মিত হন।

—হ্যাঁ, তুমি ডেভিল! ওকে কিছু বলতে পারলে না?

সেই মুহূর্তে প্রিয়নাথ বাসায় ঢোকে। প্রিয়নাথকে দেখেই আদিনাথ ফেটে পড়েন—এসেছ? এসেছ তুমি?

—কি হল?

—এ নরকে থাকতে চাই না। এও শুনতে হলো? আমি ডেভিল? সত্তর বছরের বুড়ো জল টানবে, সামান্য বালতিটাক জল টেনে হেল্প্ চাইলে, মুখের উপর ডিফাই?

প্রিয়নাথের মাথায় আগুন ধরে যায়। এ ঘটনা তার কাছে অভাবিত। সেও তো একটা মানুষ। জলটানার ইতিহাস শুনে আস্তে জিজ্ঞেস করল—কল্যাণী কোথায়?

—বেরিয়েছে।

—জল আনিসনি তুই? প্রিয়নাথের প্রচণ্ড আক্রোশের সামনে খোকা চুপ করে ঘাড়টা বাঁকিয়ে এমনভাবে তাকায় যে চোখের পলক পড়তে চায় না।

—আনিসনি তুই? জবাব না পেয়ে দু পা এগিয়ে কষে একটা থাপ্পড় লাগাতেই, খোকা প্রিয়নাথের মুখোমুখি তাকায়। চোখে কোন জল নেই।

—আনবো না।

—কি?

—আনবো না। জানলা থেকে টুকাই যখন অপমান করল, দাদু কিছু বলেছে? রাগে থর থর করে কাঁপছে খোকা।

—তুমি নিজের কাজ করছ, কে কি বলল তাতে কি? দাদু কি বলবে?

খোকা চিৎকার দিয়ে উঠল—না। আমি গুলি করব, টুকাইকে মায়ের ভোগে দেব। পেটো···পেটো ঝাড়ব। রাগতে রাগতে চোখ ফেটে জল আসতে ঠাকুমার কোলে ঝাঁপিয়ে, চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে।

সন্ধ্যারাত ধরে আজ বাসায় কেউ কারও সঙ্গে কথা বলল না। মঞ্জু প্রিয়নাথের সঙ্গেও নয়। আদিনাথ একবার জিজ্ঞেস করেন—কোথায় ছিলি সারাদিন ?

—কাজে। প্রিয়নাথের ছোট্ট জবাব। মনে মনে সে ভাবছিল জীবনে যাই ঘটুক, এই চরম মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। খোকা বড় হচ্ছে, তাদের বংশের দেবনাথ রায়। আমাদের নতুন প্রজন্ম অভিশপ্ত, ভঙ্গুর হয়ে উঠবে।

রাতে খাওয়ার আসতে পরিস্থিতিটা একটু হালকা হয়ে গেল। নাটকীয় ভাবে পরিবেশ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্তে বাসার সবাই হকচকিয়ে যায়। প্রিয়নাথ তলে তলে যে মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিল এরা এত দিন টেরই পায়নি। কল্যাণী রুটি চিবোচ্ছিল, হঠাৎ চোয়াল জোড়া থমকে যায়। প্রিয়নাথ কথা বলে না। অনেক পর একগ্লাস জল খেয়ে কল্যাণী বলে—কিন্তু তোর সঙ্গে যে কথা ছিল ?

—বল।

—সুবিমলদা বলতে বলেছে।

—কি ?

—কমলেশবাবুকে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছে।

—কি রাজি করিয়েছে ?

—মেট্রো কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করবে। এক্ষুনি জয়সোয়ালকে দিচ্ছে না। আমরা থাকতে পারব, পাঁচ দশ বছর তো বটেই।

—তুই বলেছিলি সুবিমলকে ?

—তেমন ভাবে নয়। বাবা নাকি একদিন কমলেশবাবুদের বাড়ি গিয়ে কমপ্লেইন করে এসেছে। ওরাতো ঠিকই করেছিল বেচে দেবে। সুবিমলদা বলতে সুরঞ্জনদা ঠেকিয়েছে।

হঠাৎ প্রিয়নাথ খাওয়া থামিয়ে দেয়। চোখজোড়া জ্বলে। এ রকম প্রতিক্রিয়া কোনদিন দেখা যায় নি ওর মধ্যে।

—দয়া? দয়ার উপর বেঁচে থাকতে হবে?

—অন্তত সুবিমলদা সম্পর্কে এ কথা বলতে পারিস না।

—কারো কোন কথা নয় কল্যাণী। আজও দয়ায় বেঁচে থাকব আমরা? বেশ, আমি সুবিমলের সঙ্গে কথা বলব। মাঝপথে খাওয়া ফেলে, জলটুকু গলায় ঢেলে প্রিয়নাথ উঠে পড়ে। মঞ্জু বিরক্ত হয় কল্যাণীকে বলে—কথাটা বলার আর সময় পেলে না?

—আমি কি বললাম?

—ক্লান্ত লোকটাকে বিরক্ত না করলেই হতো। কল্যাণী খানিক নীরব থেকে অভিমানে বলে ওঠে—আমার দায় পড়েছে যেন!

কয়েকদিন পর সকালে পত্রিকা অফিস থেকে টেলিফোনে সুবিমলকে ডাকিয়ে আনল প্রিয়নাথ। এ সময়ে অফিসে বিশেষ ভীড় থাকে না। খোদ ভূবনবাবুর ঘরে বসে নিভৃতে দুজনে কথা বলতে বলতে, প্রিয়নাথই প্রকাশ করল—তুমি চেষ্টা করো না সুবিমল। আইনে হয়ত আরও কিছু দিন থাকতে পারি কিন্তু অনেক কিছুর চাপ আছে, আমার উঠে যেতে হবেই। সুবিমল এ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। এত সকালে প্রিয়নাথের টেলিফোন পেয়ে বেশ বিস্মিত হয়েছিল। ভেবেছিল কল্যাণীর কোন ব্যাপার! নইলে প্রিয়নাথ জীবনে এ বাড়িতে টেলিফোন করেনি। নিজেকে ধাতস্থ করে সুবিমল বলে—কিসের চাপ?

—ও তুমি বুঝবে না।

—বেশ তো, মেট্রোরেল শেষ হতে অন্তত দশ বছর! ততোদিন রইলেন? কমলেশবাবু কথা দিয়েছেন।

—না, সুবিমল। শুধু ওটাই ভাবছো কেন, আমাদেরও ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে। খোকাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখতে চাইনা। সময় কারও জন্য বসে থাকে না।

সুবিমল খানিক চুপ থেকে, ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাবেন?

—বাইরে কোথাও!

—এত দিনের অভ্যেস ত্যাগ করে?

—অভ্যেস গড়তে কদিন? তবু খোকার নিজের পরিবেশ বুঝে নেয়া দরকার।

এইবার সুবিমল সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করল—কল্যাণী?

চোখ ছোট করে প্রিয়নাথ সিগেরেট টানে। ইতিমধ্যে চা আসতেই, 'খাও' বলে একটা কাপ ঠেলে দেয় সুবিমলের দিকে। নিজে লম্বা একটা সিপ্ করে বলে—হ্যাঁ, তোমাদের একটা সম্পর্ক আছে। সুবিমল, আমি জেনেও এতদিন কিছু বলিনি। মনে হয় এখানেই ইতি টানা দরকার।

—মানে?

—এটা কলকাতা, শহর! সব কিছুই গণ্ডীর মধ্যে। গণ্ডী ভেঙ্গে কিছু ধরে রাখা যায় না। মনে হয় কল্যাণীকে আমাদের সঙ্গে ছেড়ে দেয়া উচিত।

—এটা কি কল্যাণীরও মত?

—অবশ্যই নয়। যাই হোক, সে একজন মেয়ে। পাকা বুদ্ধি নেই, অনেকটা তোমারই মত!

সুবিমল কঠিন মুখে বলে—আমি বিশ্বাস করি না।

—প্রমাণ চাও? দিতে পারলে খুশি হতাম। আপাতত সে আমাদের সঙ্গেই থাকুক। ভবিষ্যতে আমার ভুলটা যদি বুঝিয়ে দিতে পার, হার স্বীকার করে নেব।

—আপনি, আপনি এটা জোর করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আমি আমার influence খাটাতে পারি সেটা হয়ত দুই পরিবারের পক্ষে বিশ্রী হয়ে যাবে। কিন্তু এই কলকাতার কোথাও কি আপনি বাসার চেষ্টা করেছেন? সত্যি, আপনার সম্পর্কে অন্য ধারণা ছিল আমার।

—কি রকম?

—এ তিরিশ বছরে ইমোশনালি ইনভল্‌বড্‌ হননি কলকাতায় ?

চারমিনারের ধোঁয়ায় প্রিয়নাথের চোখ জোড়া অস্পষ্ট হয়ে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছাই ঝাড়েন।

—টু লেট ! প্রফুল্লবাবুকে বলো। ওঁদেরও এই সিদ্ধান্ত !…আর হ্যাঁ, কি বলছিলে ? ইমোশন ? তা হবে না কেন ? জীবনের বেশ সময়টাই এখানে ইনভল্‌বড ছিলাম…

— তবে ?

—ধরো, পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি। কত লোকইতো শহর ছেড়ে বেড়াতে যায়। ধরো আমরা দশ বিশ এক পঞ্চাশ বছরের জন্য বাইরে যাচ্ছি। আমাদের সময়টা একটু বেশী। তারপর না হয় আসা যাবে, তবে কথা দিচ্ছি ফিরে আমরা আসব-ই, কলকাতা এ ভাবে চলতে পারে না আমাদের যৌবনের কলকাতা, ইমোশন তো নিশ্চয়ই।

প্রিয়নাথের সমস্ত কথা তাঁর সুবিমলের কাছে হেঁয়ালির মত লাগে। কোন জবাব খুঁজে পায় না সে। একটা তীব্র অভিমান, খেদ জন্মায় কল্যাণীর পরে। মনে হচ্ছে চলে যাওয়ার পিছনে কল্যাণীরও নীরব সমর্থন আছে। তবে কি ও পুতুল খেলা করে গেছে এতদিন ? মেয়েটার সাথে মোকাবিলার কথা ভেবে, সুবিমল ঘর থেকে বেরিয়ে স্কুটারে ওঠে। প্রিয়নাথ ভয়ানক দুর্বলতা অনুভব করে।

৮

সকাল থেকেই আকাশে ছিল মেঘ আর ঈষৎ আলোর লুকো-চুরি খেলা। হয়ত ফোঁটাফোঁটা বৃষ্টিও ছিল। কলকাতার দূষিত বাতাসমণ্ডিত বৃষ্টির ফোঁটা। হয়তো বা পেছল পাঁকের আস্তরণ! রাস্তায়, গলিতে, ফুটে, ডাস্টবিন ঘিরে কিংবা মস্ত খোঁড়াখুঁড়ি করা খোঁদলে! আলোর আভা ছিল এ্যানটিনার রূপোলী জটে, দোতলা তিনতলার কার্নিশে, পর্দায়, ডবল ডেকার, স্পেশাল, ক্যাডিলাক, অ্যামবাসাডার বা গাছগাছালির পাতায়। সকাল সকাল রান্না খাওয়া হয়ে গেছল সবার। স্মৃতি, বেদনা, শূন্যতা ও অনিশ্চয়তার দোলাচলচিত্ততা ছিল সবার। কেউ বিশেষ কথা কইতে চাইছে না আজ। প্রিয়নাথের মনে সাতচল্লিশের স্মৃতি ভাসে। সেদিনের পটভূমিকা অনেক পাল্টে গেছে। প্রাণ হাতে নিয়ে কেউ নেই আজ। কিন্তু সেদিন আদিনাথের দুশ্চিন্তার বোঝাটা আজ যেন প্রিয়নাথ মাথায় বহন করে নিয়েছে, আর প্রিয়নাথের বিস্ময়, মুগ্ধতার সমস্ত ছায়াটুকু হুবহু আজ সে খোকার চোখেমুখে প্রত্যক্ষ করল।

কেবল তথাগত এসেছে। ছেলেটিকে রাখতে পারেনি সে আইনও বাঁচাতে পারেনি। দাসকেবিনের মোগলাই তৈরীর অংশটা কাল রাতে ভাঙা পড়েছে, সকাল থেকে শীতল তাই নিয়ে ব্যস্ত। প্রিয়নাথের ঠিকানা বদলের সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি সে জানে। শঙ্কর হাজির হয়েছে সকাল বেলা।

অনেক কষ্টে প্রিয়নাথ একটা লরি যোগাড় করেছে অনেক দামে। কোন বিকল্প ছিল না আর। একে একে সমস্ত মাল ওঠানো হলে দেখা গেল আদিনাথের অসংখ্য বই উই আর রূপোলী পোকায় খেয়ে দিয়েছে। তথাগত তুলতে দ্বিধা করছিল, প্রিয়নাথ জোর গলায় নির্দেশ দিল, সব যাবে, স্মৃতি কিছু পড়ে থাকবে না এখানে।

সমস্ত বাসা এখন লাগছে আরও জীর্ণ। ঘন সবুজ বটগাছটি কার্নিশে চুপটি করে আছে, আর কড়িবর্গার ঘুণ নিঃশব্দে ঝরছে খাঁ খাঁ মেঝেতে। রান্নাঘরে তিরিশ বছরের কালো ধোঁয়ার চিহ্ন। কেবল কাঠের নেমপ্লেটটা তুলতে গিয়ে দেখা গেল খোকার আঁকাগুলো— মানুষ, মাছ আরও অনেক কিছু।

দুই স্তরে যাত্রা ভাগ করা হয়েছে। শঙ্কর বাসার অন্য সবাইকে নিয়ে চলে গেল ট্রেনে। লরির সাথে রইল তথাগত, প্রিয়নাথ আর খোকা। খোকার পকেটে নতুন ঠিকানার চিরকুটটা গুঁজে দিয়ে প্রিয়নাথ বলে, ঠিক করে রেখো হারায় না যেন।

টালি আর টিনের চালার লোকেরা সারা সকাল সঙ্গে ছিল আর মিঃ শূর, ডঃ নন্দীদের বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে লরিতে তোলা মালগুলো খুঁটিয়ে দেখছিল, কখনো বা মুচকি হাসছিল প্রিয়নাথকে দেখে। একবার জিজ্ঞেসও করেছিল কোথায় যাচ্ছে তারা। সব কিছু মিলিয়ে অবর্ণনীয় মানসিক অবস্থায় ওরা লরিতে উঠল, তারপর শুরু হল যাত্রা। বড় রাস্তায় পড়ে লরিটা দ্রুত ছোটে। নতুন ওভার ব্রিজে ওঠে, হোর্ডিংগুলো সরে সরে যায়। মিনি ক্রনি সলিড-স্টেট—ওয়েষ্টন টি.ভি! ক্রিস্টাল ইলেকট্রনিক গ্যাস লাইট! বোম্বে ডাইং! হোটেল ফাইভ স্টার! স্যাফরি লাগেজ!

সারা সকাল খোকার মধ্যে ফুটন্ত উত্তেজনা ছিল। প্রিয়নাথের কথা বলতে ভালো লাগছে না। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে খোকা কাঁদছে। ছোট ছোট ডুকরে ওঠার ফোঁপানি।

—কাঁদছিস যে?

—কোথায় যাব বাবা?

—ডায়মণ্ডহারবার।

—সমুদ্র আছে না?

প্রিয়নাথ চুপ করে থাকে। হোর্ডিংগুলো দ্রুত সরে যেতে, খোকার মনে হল সত্যি তারা বহুদূরে চলে যাচ্ছে। কে যেন তাকে টেনে রাখতে চায়। ইচ্ছে হচ্ছে এখুনি সে নেমে যায়।

বোকার মত জিজ্ঞেস করল—আমরা যাচ্ছি কেন? গ্রামে কি হবে?

প্রিয়নাথ উত্তর খুঁজে পেলনা। ঐটুকু ছেলেকে কি বলবে? অনেক ভেবে আস্তে জবাব দিল—তুই যে বলিস এখানে ভালো লাগেনা, টকাই মারে, কোথাও যেতে পারিস না, স্কুলের ছেলেরা হাসে?

—তাই বলে অতদূব গাঁয়ে?

—এখানে ধুলো-ধোঁয়ায় ভর্তি, তুই বলতিস? ডাস্টবিনের পাশে লোক বসে থাকলে ভয় পেতিস?

—ওখানে আলো নেই, সন্ধ্যায় ঘুটঘুটে অন্ধকার যে?

—ওখানে তাজা রোদ আছে, পাস এখানে?

—কাদা, সাপ, ভূত, জঙ্গল আছে যে? ভয় করেনা?

—ছুটতে পাবি, খেলতে পাবি, হৈ চৈ করবি। এখানে যে ঘরে বসে থাকিস?

প্রিয়নাথ খোকাব দিকে সস্নেহ দৃষ্টি বোলায়। মুখটা গভীর করুণ লাগছে। ডায়মণ্ডহারবার! ডায়মণ্ডহারবার! খোকা অস্ফুট করে ব্যাকুলভাবে বলে—আমরা আর এখানে ফিরবনা?

প্রিয়নাথ হাসতে হাসতে বলে—দেখনা, একদিন কোলকাতাকেই তুলে বসিয়ে দেব ওখানে! তখন? ফিরতে চাইবি? বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলচিত্তে খোকা বাবার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল—ধ্যৎ! সে তুমি পারবে নাকি? প্রিয়নাথ সংক্ষিপ্ত করল প্রসঙ্গ—কি হয়েছে! আমি না পারি, তোরা তো পারবি!

বাবার উত্তর খোকার কানে যায় না। সে কল্পনায় ডায়মণ্ড-হারবারের সমুদ্র প্রত্যক্ষ করে। টি. ভি-তে ডঃ নন্দীর বাড়ি খোকা একবার সমুদ্র দেখেছিল। চেতনায় দেখল এখন সমুদ্রের সফেন ঢেউ রুদ্রমূর্তিতে সৈকত রেখায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে, বইছে এলোমেলো বাতাস। আর রাস্তাব যানবাহন ও বাতাসের গর্জনের মধ্যে বাবার উত্তরটা অস্পষ্ট প্রতিধ্বনিত হল—তোরা তো পারবি···তোরা তো···